তাকফীর এর ব্যাপারে সতর্ক হন

শাইখ আবু হামজা আল-মিশরীর একটি বই থেকে নেওয়া

ClarificationOfTheDoubts/

justpaste.it/ClarificationOfTheDoubts

তাকফীর
এর ব্যাপারে সতর্ক হন

শাইখ আবু হামজা আল মিশরী

ইমাম দাহহাক (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যে কেউ একজন মুমিনকে লানত করলো, সে যেন তাকে হত্যা করলো। আর যে কেউ কোন মুমিন এর উপর কুফর এর অভিযোগ আনলো, সে যেন তাকে হত্যা করলো।”

(ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইকে ‘হে কাফের’ বলে সম্বোধন করে, তখন তাদের যেকোন একজন কাফের এ পরিণত হলো।”

(ইমাম আহমদ, ইমাম বাজ্জার, ইমাম তাবারানী, ইমাম বাইহাকী, ইবনে আওনাহ বর্ণনা করেছেন)

সূচিপত্র

• • •

মুখবন্ধ - ৫

কুফর কি এবং কাফের কে? - ৬

তাকফীর কি এবং এর প্রকারভেদ - ১৩

তাকফীরের প্রতিবন্ধকতা সমূহ কি কি? - ২১

তাকফীর ও মুমিনদের প্রতি সন্দেহ - ২৫

যে পার্লামেন্টে (সংসদে) যোগদান করে, তার ক্ষেত্রে হুকুম - ২৫

যে ব্যক্তি ভোটদান কাজের সাথে জড়িত - ৩১

কুফরী কাজ এবং যে ব্যক্তি কাজটি করছে - তাদের মাঝে পার্থক্য - ৩৩

তাকফীর বিষয়টির ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদ্ধতি - ৩৯

কাফের সৈনিক অথবা বর্তমান মুসলমান দেশের সেনাবাহিনী থেকে সাহায্য নেয়ার ক্ষেত্রে হুকুম - ৪০

তাওয়ীল ও জুহুল এবং এগুলো তাকফীরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণ - ৪০

তাকফীর এর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর নীতি - ৪৮

এই ধারণা করা যে - বর্তমানে বেশীরভাগ মুসলমানই কাফের: অল্প কিছু মুসলমান আমলকারী আর ৯৫ %মুসলমানই কাফের!!! - ৫১

উপসংহার - ৫৫

• • •

মুখবন্ধ

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা, এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হচ্ছে মুসলমানদেরকে ভবিষ্যত কিছু সমস্যার ব্যাপারে সতর্ক করার একটি ধাপ। যে সকল বিষয় এই উম্মাতের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে বিশাল ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে সে সকল বিষয় সম্পর্কে এই উম্মাতকে সতর্ক করা সামর্থ্যবান সকল মুসলমানের জরুরি কর্তব্য।

বিগত কিছু বছর ধরে এই উম্মাতের মধ্যে আবার 'তাকফীরী চিন্তাধারা' প্রসার লাভ করেছে। যার ফলাফল হলো: একে অন্যের উপর অযাচিত আক্রমণ করা, আহত করা, স্বামী-স্ত্রীর দু'জন বা যে কোন একজনের অনুমতি ছাড়া বাধ্যতামূলক বিবাহ-বিচ্ছেদ, প্রকৃত ওয়ালী (অভিভাবক) বাদ দিয়ে নিজে থেকে মুসলমান বোনদের জন্য ওয়ালী নিযুক্ত করা কিংবা হারাম কাজে অর্থ যোগান দেয়ার জন্য মাদক দ্রব্য কেনাবেচা করার মতো জঘন্য কর্মকান্ড।

কিন্তু সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি হয়েছে তা হলো তাকফীর এর ক্ষেত্রে "আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ" এর সুস্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিসমূহকে সাধারণ মুসলমানদের জন্য অস্পষ্ট করে ফেলা। আর ইহা করার কারণেই উপরে উল্লিখিত কাজগুলি করা সম্ভব হয়েছে। তাই মুসলমানদের কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য এখন তাকফীরের ক্ষেত্রে ভুলগুলি সবার সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা জরুরি হয়ে পড়েছে।

=====***=====

টীকা – ১: শাইখ আবু হামজা আল মিশরী (আল্লাহ তাকে কাফেরদের হাত থেকে মুক্ত করুন) রচিত "Be Aware of Takfir" বইটির গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য ও কার্যকর অংশসমূহ নিয়ে এই পুস্তিকাটি সাজানো হয়েছে। মূল বইটিতে তিনি যুক্তরাজ্যের আব্দুল্লাহ ফয়সাল নামক এক দা'য়ীর বেশ কিছু তাকফীরী বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন যা আমরা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিনি।

কুফর কি এবং কাফের কে?

অন্যের সাথে ব্যক্তিগত মনোমালিন্য থাকায় কিংবা ঘৃণা প্রকাশের জন্য অনেকে আজকাল তাকফীর বিষয়টির অপব্যবহার করছে। কারো উপর কুফর যাচাই বাছাই এর ক্ষেত্রে অনেকেই আজ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর পদ্ধতি পরিত্যাগ করেছে। এর ফলে অনেককে বড় কুফরীতে অভিযুক্ত করা হচ্ছে অথচ বাস্তবে ব্যাপারটা আদৌ সে রকম না। এসব অপব্যবহার বন্ধ করতে সবার আগে প্রয়োজন ‘কুফর কি’ এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা। আশা করা যায় এই আলোচনার পর মানুষকে ভুল বুঝিয়ে অযাচিতভাবে ‘তাকফীর করা’ ও ‘তাকফীর করানো’ কমে যাবে।

আভিধানিক অর্থে কুফর (অবিশ্বাস) হলো: কোন কিছুকে আবৃত এবং আড়াল করা। এমন কিছু যা কোন কিছুকে আবৃত করে রাখে, তাহলে ইহা তার (আবৃত বস্তু/বিষয়) সাথে কুফর করেছে। আর এই অনুসারে, একজন চাষী/কৃষক কে শাব্দিক অর্থের দিক থেকে কাফের বলা যায়, কারণ সে মাটি দ্বারা বীজকে ঢেকে দেয়। যেমন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ

“**যেমন বৃষ্টির দৃষ্টান্ত,এর দ্বারা উৎপন্ন ফসল কাফেরদের আনন্দ দেয়।**” - সূরাহ্ আল হাদীদ: ২০

এর অর্থ হলো, ইহা কৃষকের জন্য আনন্দদায়ক এবং এই অনুসারে কৃষককে কাফের বলা হয়েছে।

অনুরূপভাবে একজন কাফেরকে ‘কাফের’ বলা হয় কারণ সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুগ্রহকে আড়াল করেছে। আল আজহারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

“আর তাঁর অনুগ্রহসমূহ হলো তাঁর তাওহীদের প্রমাণিত নিদর্শনাবলী। আর একজন কাফের আল্লাহর সেসকল রহমতের নিদর্শনগুলোকে অস্বীকারের পর্দায় আচ্ছাদিত করে রাখে যেগুলোর মাধ্যমে লোকেরা সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর একাত্ববাদের চিহ্ন দেখতে পায় এবং বুঝতে শিখে যে, আল্লাহ এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আর একইভাবে তিনি তাঁর অনুগ্রহস্বরূপ তাঁর রাসূলদের পাঠিয়েছেন অলৌকিক নিদর্শন সহকারে, পাঠিয়েছেন কিতাবসমূহ এবং তাঁর রহমতের অগণিত নিশ্চিত প্রমাণ।

এভাবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুগ্রহের প্রতি সত্যবাদী হয় না, এবং তা বাতিল/পরিত্যাগ করে, সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুগ্রহের ব্যাপারে কাফের এ পরিণত হয়েছে, যার মানে হলো সে তার নিজের থেকে অনুগ্রহকে আবৃত ও আড়াল করেছে।”(১)

শরীয়তের পরিভাষায় কুফর: ইহা হলো ঈমানের সম্পূর্ণ হ্রাস পাওয়া এবং ইহা ঈমানের বিপরীত। ইহা হলো মহাপরাক্রমশালী এবং মহামর্যাদাবান আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর অনুগ্রহের প্রতি অবিশ্বাস। দুই ধরনের কুফর আছে, **কুফর আকবর (বড় কুফর)** এবং **কুফর আসগর (ছোট কুফর)**। এইক্ষেত্রে, একজন ব্যক্তির আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহ্মত এবং অনুগ্রহকে নিজের বা অন্যদের থেকে আবৃত ও আড়াল করার কাজকে কুফর বলে।

কুফর আকবর (বড় কুফর): সাধারণভাবে ইহা হলো আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর রাসূলগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, আখিরাত এবং তাকদীর ও পূর্বনির্ধারিত বিষয় সমূহের ভাল ও মন্দ দিক – এগুলোর সবকয়টিতে অথবা এগুলোর যেকোন একটি স্তম্ভে অবিশ্বাস করা। ঈমানের সম্পূর্ন বিপরীত কোন কিছু প্রকাশ করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যেমন: এমন কথা, কাজ এবং বিশ্বাস যা ঈমানকে বাতিল করে দেয়। তাছাড়াও যদি কেউ ইসলামের স্তম্ভসমূহের অনুশীলন না করে, যেগুলোকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একজন ব্যক্তির জান, মাল ও ইজ্জতের সংরক্ষণ করার জন্য

---

(১) লিসানুল আরব এর ‘কুফর’ শব্দের অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রকাশ্য নিদর্শন বানিয়েছেন, তবে ইহাও রিদ্দাহ্ (দ্বীনত্যাগ) এর দিকে ধাবিত করে। আমাদের সময়ে অনেক মানুষই মনে করে থাকেন যে, কুফর হলো শুধু মাত্র কথার দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, কিন্তু ইহা আহলে সুন্নাহ এর আকীদা নয়। বিভিন্ন প্রকারের কুফর আছে যেগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আল কোরআন এবং সুন্নাতে উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে কুফর আকবর (বড় কুফর) সংগঠিত হয় নিম্নোক্ত কুফরসমূহের দ্বারা,

১। **জুহুদ:** ইহা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করা, যেমন: কোন নবী, কোন অলৌকিক ঘটনা, কোন ফেরেশতা অথবা কোন কিতাব যা ঐ নবীদের দ্বারা পাঠানো হয়েছে। ইহা ৩ প্রকার:

ক. জুহুদ আল কলব (হৃদয়/অন্তর – এর অস্বীকার করা): ইহা বড় কুফর এবং ইহা তাদের সাথে হয়ে থাকে যাদের নিজেদের হৃদয়/অন্তর এর সাথে মস্তিস্কের কোন সামঞ্জস্য নেই।

খ. জুহুদ আল লিসান: ইহা হলো নিদর্শনসমূহকে কথার মাধ্যমে অস্বীকার করা, যদিও হৃদয়/অন্তর সেগুলোকে সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছে। এই অস্বীকার করাকে ‘অহংকারের জুহুদ’ বা আত্ম-অত্যাচার (নিজের ওপর জুলুম) ও বলা যায়। ইহা অত্যাচারী শয়তান শাসকদের ক্ষেত্রে অতিপরিচিত জুহুদ। মিশরের ফেরাউন এবং তার বাহিনী ইতিহাসে জুহুদ আল লিসান এর অন্যতম উদাহরণ।

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آَيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (১৩)

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (১৪)

“অবশেষে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ যখন তাদের কাছে পৌঁছলো, তখন তারা বললো: এ তো সুস্পষ্ট যাদু। তারা অহংকারের সাথে এবং অন্যায়ভাবে নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান/অস্বীকার (জুহুদ) করলো, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলেই বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল?”- সূরাহ্ আন নাম্‌ল: ১৩-১৪

গ. জুহুদ আল ‘আমাল: কাজের মাধ্যমে জুহুদ। ইহা এমন ব্যক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যে মুখে অস্বীকার করছে না, কিন্তু কাজের দ্বারা অস্বীকার করছে। যখন কেউ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা বলেছেন তার সরাসরি বিরোধীতা/আপত্তি না করে বিপরীত কোন কিছুর ঘোষণা দেয়, তখন তা সম্পন্ন হয়। যখন কেউ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আদেশের সরাসরি বিরোধীতা/আপত্তি না করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তার বিপরীত কাজ করে, তখনও ইহা সম্পন্ন হয়।

এর একটি উদারহরণ হলো, একজন শাসক যখন জানে যে বিবাহিত ব্যক্তির ব্যাভিচারের শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড। কিন্তু, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিচার বিধান প্রয়োগ করার বদলে সে একটি আইন করলো যে, ব্যাভিচারীদেরকে শুধুমাত্র জেলবন্দী করা হবে। যদিও সে স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহর ঐ আইনকে অস্বীকার করেনি, কিন্তু এই আদেশের বিপরীত কাজ করার মাধ্যমে সে তা অস্বীকার করেছে।

২। **তাকযীব:** ইহা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কথা, নিদর্শনাবলী বা ওয়াদার মধ্য থেকে কোন কিছুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা বা অস্বীকার করা, উদাহরণ স্বরূপ: বিচার দিবসকে (কেয়ামতের দিন) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা বা অস্বীকার করা।

ইহা ৩ প্রকার:

ক. তাকযীব আল কলব, যেখানে হৃদয়/অন্তর সত্যকে প্রত্যাখ্যান/অস্বীকার করে।

খ. তাকযীব আল লিসান, এর দু’টি রূপ রয়েছে,

অ) সরাসরি বিরোধীতা/আপত্তি করা, কথার মাধ্যমে, যেমন একথা বলা যে, “আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এরূপ বলেছেন, কিন্তু তা সঠিক হতে পারে না।”

আ) পরোক্ষভাবে/আভাসের মাধ্যমে তাকযীব করা। এর একটি উদাহরণ হলো, যদি কাউকে বলা হয়, “আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইহা বলেছেন।” তখন সে জবাব দিলো যে, “না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঐকথা বলেছেন।” মুশরিকরাও একই রকম কথা বলেছে,

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آَبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا

“অচিরেই মুশরিকরা বলবে: আল্লাহ যদি চাইতেন তবে না আমরা শির্‌ক করতাম, আর না আমাদের বাপ-দাদারা শির্‌ক করতো এবং না আমরা কোন কিছুকে হারাম করতাম। এরূপেই তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল, অবশেষে তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছিল।”- সূরাহ্ আল আন’আম :১৪৮

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آَبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ

“আর মুশরিকরা বলবে: যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কোন কিছুর ইবাদত করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরাও করতো না, আর তাঁর আদেশ ব্যতিরেকে কোন কিছুকে হারামও করতাম না। এরূপই করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরা। রাসূলদের দায়িত্ব তো শুধু সুস্পষ্ট বাণী পৌছে দেয়া।” - সূরাহ্ আন নাহ্‌ল :৩৫

গ. তাকযীব আল ‘আমাল: একজন ব্যক্তি এমন একটি কাজ করছে যা প্রকাশ করছে যে সে অস্বীকার করছে। এর উদাহরণ আল কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে দেয়া যায়,

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (٢) وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣)

“আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে দ্বীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/অস্বীকার/প্রত্যাখ্যান (তাকযীব) করে? সে তো ঐব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করে না।” - সূরাহ্ মাঊ’ন :১-৩ (২)

এই ৩টি আয়াত সেই ভুল ধারণাকে খন্ডন করে যে, কাউকে কুফরের দ্বারা দ্বীনের বহির্ভূত হতে হলে তাকে কথার দ্বারা বড় কুফর করতে হবে| এই আয়াতগুলো থেকে দেখা যায় যে, আসলে ব্যাপারটি এরূপ নয়| এখানে আয়াতটি এরূপ নয় যে, **“আপনি কি তাকে বলতে শোনেননি”** অথবা **“সে কি কথার দ্বারা কুফর করেনি?”** যেমন: যে ব্যক্তি তার মাকে বিয়ে করে, তার ব্যাপারটিও একই রকম| যেই মুসলমান এই কাজ করে, সে দ্বীন থেকে বহির্ভূত হয়ে পড়ে এবং কাফের এ পরিণত হয়| তাকে দ্বীন ত্যাগ করার জন্য কোন কিছু বলতে হবে না। সে যেসকল কাজকর্ম প্রদর্শন করেছে, তা দেখিয়ে দিয়েছে যে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অধিকার/হককে অস্বীকার করে। নিম্নোক্ত আয়াতটি তাকযীবের সাধারণ রূপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য,

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (١٤) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٥) أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (١٦)

---

(২) এর মানে এই না যে, যে ব্যক্তি দরিদ্রদের কে খাওয়ায় না, সে কাফের, কিন্তু এই দলিলটি পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যে, যারা তাদেরকে যে কাজের আদেশ দেওয়া হয়েছে, ঠিক তার বিপরীত কাজগুলো করে, তারাই সর্বোচ্চ স্তরের তাকযীব করছে, যা হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরন। বর্তমান যুগের শাসকগণ এই ধরনের তাকযীব করে থাকে। যদি শরীয়তের সাথে এরূপ করা হয়, তবে তা একজনকে তার দ্বীনের বহির্ভূত করে, যা বর্তমান শাসকদের ক্ষেত্রে হয়েছে।

“আপনি কি জানেন, কেমন সেই বিচার দিবস? সেদিন মুকাযযিবদের (তাকযীবকারী/প্রত্যাখ্যানকারী/অস্বীকারকারী) বড়ই সর্বনাশ হবে। আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি?” - সূরাহ্ আল মুরসালাত :১৪-১৬

৩। ইস্‌তিক্‌বার: প্রকৃতপক্ষে এই কুফর হলো সত্যের প্রতি অহংকারী ও উদ্ধত হওয়া, এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিদর্শনাবলী উপস্থাপন করা হলে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা,

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (৭১) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (৭২) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (৭৩) إِلا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (৭৪)

“স্মরণ করুন, আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন: আমি মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করবো। যখন আমি তার সৃষ্টি কার্য সম্পন্ন করবো এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় অবনত হয়ে যেও। অতঃপর সকল ফেরেশতাই একযোগে সিজদায় অবনত হলো – কেবল ইবলীস ছাড়া। সে অহংকার (ইস্‌তিক্‌বার) করলো এবং কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে গেল।” - সূরাহ্ সদ :৭১-৭৪

৪। ইস্‌তিহ্‌যা: এই পাপকর্ম হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যেকোন নিদর্শন নিয়ে উপহাস করা বা সেটিকে ঠাট্টার বিষয় বানানো। ইহা হতে পারে দ্বীন ইসলামকে ঠাট্টার বিষয় বানানোর মাধ্যমে, অথবা দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত যে কোন বিষয়কে উপহাস করার মাধ্যমে, যেমন: মুসলমান নারীদের মুখমন্ডলের উপর নিকাব পরা, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বাধ্যতামূলক করেছেন, আল কোরআনের আয়াত সমূহ বা উক্তিসমূহ, এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নতের কাজসমূহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ ধরনের মানুষের পরিণাম সম্পর্কে বলেছেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (৬৫) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (৬৬)

“বলুন: তবে কি তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াত সমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ (ইস্‌তিহ্‌যা) করছিলে? তোমরা এখন ওজর পেশ করো না; তোমরা তো কুফর করেছ নিজেদের ঈমান প্রকাশের পর। তোমাদের মধ্যে কোন দলকে আমি ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেবই, কেননা তারা ছিল অপরাধী।” - সূরাহ্ আত্‌ তাওবাহ :৬৫-৬৬

৫। ই’রাদ: ইহার স্বরূপ হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একজনকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে পথ প্রদর্শনের জন্য যা কিছু সতর্কবাণী ও নিদর্শনাবলী দেন, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও পলায়ন করা। নিম্নোক্ত উপায়ে এসকল মানুষদের উল্লেখ করা হয়েছে,

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (৪৯) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (৫০) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (৫১) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً (৫২) كَلا بَلْ لا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ (৫৩)

“তাদের কি হলো যে, তারা এই উপদেশ/যিকির (আল কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে (ই’রাদ) নেয়? যেন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত বন্য গাধা, যা সিংহ থেকে পলায়ন করছে। বরং তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত লিপিকা প্রদান করা হোক। না, তা কখনোই হবেনা। বরং তারা তো আখিরাতের ভয় পোষণ করে না।” - সূরাহ্ আল মুদাস্‌সির :৪৯-৫৩

৬। **’ইনাদ:** এই ধরনের কুফর হলো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং তার নিদর্শনাবলীর বিরুদ্ধে একগুঁয়ে/জেদি হওয়া এবং অন্যদেরকে বা নিজেকে কুফরের উপর রাখার জন্য জিদ/পীড়াপীড়ি করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (২৪) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (২৫) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (২৬)

“(আল্লাহ ফেরেশতাদ্বয়কে হুকুম করবেন) তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ করো জাহান্নামে প্রত্যেক কঠোর হঠকারী/একগুঁয়ে/জেদি (’ইনাদ) কাফেরকে, নেক কাজে বাধা প্রদানকারী, সীমালংঘনকারী, সন্দেহসৃষ্টিকারীকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ স্থির করেছিল, তাকে তোমরা কঠোর আযাবে নিক্ষেপ করো।” - সূরাহ্ ক্বফ :২৪-২৬

৭। **ইস্তিব্দাল:** ইহা হলো শরীয়তকে প্রতিস্থাপন করার কুফর, আর ইহার প্রকাশ ৩ ধরনের, যা আল্লামাহ্ ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম (রাহিমাহুল্লাহ) সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন।

ক. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আইনকে মানব রচিত আইন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা। এই ক্ষেত্রে একজন প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং ইহাকে শরীয়তের উপর আরোপ করে অথবা সে তার নিজস্ব বাতিল শরীয়ত তৈরী করে। এর উদাহরণ নিম্নে বলা হয়েছে,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“অথবা তাদের কি এমন কতক শরীক আছে, যারা তাদের জন্য এমন এক দ্বীনের প্রণয়ন করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর যদি ফায়সালার বাণী না থাকতো, তবে তো তাদের ব্যাপারে মীমাংসা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই জালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।” - সূরাহ্ আশ শূরা: ২১

তাছাড়াও, যারা আইন প্রণয়ন করতে চায়, অথবা এমনকি মনগড়া আইন প্রণেতার দিকে ধাবিত হয় তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“তবে কি তারা জাহিলিয়াতের বিধান কামনা করে? বিধান প্রদানে আল্লাহর চাইতে কে উত্তম দৃঢ় বিশ্বাসী লোকদের জন্য?” -সূরাহ্ আল মায়িদাহ :৫০

খ. আনুষ্ঠানিকভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আইন অস্বীকার/পরিত্যাগ না করে, তা অস্বীকার করা। ইহা সেই ব্যক্তির কথার ন্যায় যে বলে, “এই নির্দিষ্ট আইনটি বর্তমান সময়ের সাথে উপযুক্ত/মানানসই নয়, কিন্তু ঐ অন্যান্য আইনগুলো এখনও সন্তোষজনক।”

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (৮৫) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (৮৬)

“তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে অস্বীকার/প্রত্যাখ্যান করো? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে তাদের অসম্মান/দুর্গতি ছাড়া কোন পথ নেই, এবং কেয়ামতের দিন তাদের কঠোরতর শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফেল/বে-খবর নন। এরাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে; সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না।” - সূরাহ্ আল বাকারাহ :৮৫-৮৬

মূলত, ইহা হলো একটি আইনকে অস্বীকার করা, আবার অন্য একটিকে স্বীকার করা।

গ. আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তা পরিত্যাগ/অস্বীকার করা। ইহা হয়, যখন কেউ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আইনকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার করতে সব সময় ব্যর্থ হয়।

এই ৩য় ধরনের ইসতিবদাল সেসকল আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, যেসকল আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফের (অবিশ্বাসী)।" - সূরাহ্ আল মায়িদাহ :৪৪

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই জালেম (অত্যাচারী)।" - সূরাহ্ আল মায়িদাহ :৪৫

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই ফাসেক (বিদ্রোহীপাপী)।" - সূরাহ্ আল মায়িদাহ: ৪৭

আমাদের সামনে যে দলিলসমূহ আছে, তা অনুসারে, যদি কেউ শরীয়ত অনুসারে বিচার করতে থাকে এবং একটি বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে সে শরীয়তের শাস্তি আরোপ না করে এই কারণে যে, অপরাধী তার ঘনিষ্ট বন্ধু, পরিবারের সদস্য ইত্যাদি, এই ক্ষেত্রে আমরা একে বলি, **কুফর দুনা কুফর (একটি কুফর, যা কুফর হতে কম),** একটি ছোট কুফর।

কিন্তু যখন একজন ব্যক্তি এইভাবে আইনকে পরিবর্তন করে ফেলে যে, তা শুধুমাত্র একটি ব্যক্তির জন্য বা বিশেষ একটি পরিস্থিতির জন্য নয়, বরং আগত সবসময়ের জন্যই সেই পরিবর্তিত আইন প্রযোজ্য হবে, তা হলে সেটি একটি বড় কুফর। কিন্তু, যদি সে শরীয়তে বিদ্যমান আইনের মধ্যে নতুন কোন শর্তারোপ করে বা তাতে নতুন কিছু যোগ করে, তবে ইহা হলো **কুফর ফাওকা কুফর (কুফরের উপর কুফর),** নিঃসন্দেহে একটি বড় কুফর(৩)।

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফের (অবিশ্বাসী)।" - সূরাহ্ আল মায়িদাহ: ৪৪

ইহা হলো সম্পূর্ন অনাবৃত ও নিশ্চিত কুফর যা ভয়ংকর অসন্তোষজনক এবং ভয়ানক কদাকার। শরীয়তকে অগ্রাহ্য করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ক্রোধ ছাড়া আর কোন কিছুই অর্জন করা যায় না, আর ইহা এমন কিছু, যা থেকে নির্ভেজাল ঈমানদারদের বহুদূরে অবস্থান করা উচিত।

=====***=====

---

(৩)এছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের বড় কুফর রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ: কুফর আল ইন্‌কার: ক্বল্‌ব (হৃদয়/অন্তর) ও কথা উভয়ের মাধ্যমে ইন্‌কার/অস্বীকার করা (সূরাহ্ আন নাহ্‌ল: ৮৩)। কুফর আল কুর্‌হ: আল্লাহর যেকোন আদেশকে তীব্রভাবে ঘৃণার ফলে সংঘটিত কুফর (সূরাহ্ মুহাম্মাদ: ৮, ৯)। কুফর আল ইস্‌তিহ্‌লাল: হারামকে হালাল করার চেষ্টার মাধ্যমে সংঘটিত কুফর। যে ব্যক্তি হারাম কোন কিছুকে হালাল হিসেবে গ্রহন করে, সে এই কুফর করে। এরূপ করার মাধ্যমে সে আল্লাহর হক/অধিকারে হস্তক্ষেপ করে নিজেকে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উপস্থাপন করে এবং এভাবে ঈমানের পরিধির বহির্ভূত হয়ে পড়ে।

তাকফীর কি এবং এর প্রকারভেদ

কুফর সম্পর্কে ধারণা দেয়ার পর এখন আমরা দেখবো ইসলাম গ্রহণের পর কখন একজন ব্যক্তিকে আবার কাফের হিসেবে ঘোষণা দেয়া যাবে অর্থাৎ তাকফীর করা যাবে। ফিকহ্‌শাস্ত্রের সব বড় বড় কিতাবেই এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

কিন্তু বাস্তবে অনেকেই তাকফীরের মূলনীতি ভালোভাবে বুঝতে পারেনা। খারেজীদের বিপথে যাওয়ার এবং তাকফীরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার মূল কারণ ছিল তাকফীরের মূলনীতি গুলিয়ে ফেলা এবং সব মূলনীতিকে এক ও অভিন্ন মনে করা। আমাদের উচিত এই বড় ভুলগুলো শুধরে দেয়া যাতে মুসলমান উম্মাত এরকম আচরণ দেখলে সন্দেহ-সংশয়ে না পড়ে যায়। এই অধ্যায়ে আমরা ইনশাআল্লাহ আমাদের আলোচনার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন তাকফীরের বিষয়ে আলোচনা করবো:

ক) **তাকফীরুন-নস:** (নির্দিষ্ট আয়াত কিংবা হাদীসের উপর ভিত্তি করে তাকফীর করা) ইহা হলো যখন কোন বিষয়ে কোরআন এবং হাদীসে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায় এবং সে অনুযায়ী তাকফীরের শর্ত প্রয়োগ করে কাউকে কাফের রায় দেয়া হয়। উদাহরণস্বরুপ:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبّ

“আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে।” - সূরাহ্ লাহাব: ১

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চাচা আবু লাহাবকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সন্দেহাতীতভাবে কাফের আখ্যায়িত করেছেন। এখন কেউ যদি বলে, ‘আবু লাহাব কাফের নয় – বরং মুসলমান’ তাহলে এই ব্যক্তিকে তাকফীর করা যাবে। কিন্তু তার আগে তাকফীরের প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও শর্তসমূহ যাচাই করে দেখতে হবে। এমনও হতে পারে যে ঐ ব্যক্তি নতুন মুসলমান এবং তিনি এই তথ্য জানেন না। এমনও হতে পারে যে ঐ ব্যক্তি পাগল কিংবা এ জাতীয় কিছু। কিন্তু যদি তাকফীরের মূলনীতি অনুযায়ী ঐ ব্যক্তিকে মাফ না করা যায়, তবে তার ওপর তাকফীর করতে হবে এবং কেউই ইহা অস্বীকার করতে পারবে না। ইহা দুই ব্যক্তির মধ্যে তাকফীর নয় বরং ইহা হচ্ছে ব্যক্তি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মধ্যে তাকফীর, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আবু লাহাবকে নাম ধরে উল্লেখ করেছেন।

খ) তাকফীরুল-ইজতিহাদ: (ইজতিহাদ বা ব্যক্তিগত মতামতের উপর ভিত্তি করে তাকফীর করা) যখন আল কোরআনের এক বা একাধিক আয়াতে কোন কাজকে কুফর হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যেমন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফের (অবিশ্বাসী)।” - সূরাহ্ আল মায়িদাহ: ৪৪

এই কুফর সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করা হয়েছে এবং এর রূপরেখা বোঝা হয়েছে। এই বিষয় সংক্রান্ত সকল আয়াতের সতর্ক পর্যালোচনার পরই কেবল একজন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে এবং বলতে পারে যে, ‘এই যুগে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার-ফায়সালা করে না এমন যে কোন শাসকই কাফের।’ এই প্রকার তাকফীরে কিছু নিয়ম-কানুনের কারণে মতপার্থক্যের সুযোগ আছে। এছাড়া এমনও হতে পারে যে, এই বিষয়টির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার কুফরী সংঘটিত হতে পারে। যেমন: উপরের আয়াতের ক্ষেত্রে এক পর্যায়ের কুফর হচ্ছে: যখন কোন ব্যক্তি হঠাৎ একবার কিংবা দুইবার কিংবা কখনো কখনো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিধান ছাড়া অন্য কোন আইনের দ্বারা বিচার-ফায়সালা করেছে, এই ব্যক্তি কাফের হয়নি কিন্তু সে নিঃসন্দেহে কবীরা গুনাহ করেছে ও কুফর দুনা কুফর (একটি ছোট কুফর) করেছে যেভাবে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে

নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বদাই এমন ভাবে আল্লাহর আইন বাদে অন্য আইনে বিচার-ফায়সালা করছে, সে অবশ্যই বড় কুফর করেছে এবং সে কাফের – যেভাবে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর অপর বর্ণনা ও ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায় রয়েছে।

গ) তাকফীরুল-মুয়াইয়িন: (কোন ব্যাক্তি বিশেষকে নাম ধরে তাকফীর করা) যখন কোন ব্যক্তির নাম ধরে তাকফীর করা হয়, তখন এই প্রকার তাকফীর হয়। এই প্রকার তাকফীর করার আগে অবশ্যই তাকফীরুল ইজতিহাদ করতে হবে। যদি তাকফীরের কারণ উপরের আলোচ্য বিষয় হয় যেখানে আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে অন্য আইনে বিচার-ফায়সালা করা হচ্ছে, মূলত "**যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফের (অবিশ্বাসী)**।" - এই আয়াতের ভিত্তিতে সকল ক্ষেত্রেই ইজতিহাদ একই থাকবে। এখন ইজতিহাদ যখন করা হয়ে যাবে এবং বড় কুফরের উপস্থিতিও প্রমাণিত হয়ে যাবে, তখন ভালো ভাবে ইহা যাচাই করে নিয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, কোরআনের আয়াত এবং কুফরের অভিযোগ উভয়ই অভিযুক্তর জন্য যথাযথভাবে মানানসই কিনা। তারপর দেখতে হবে কোন শর্ত কিংবা বাধা আছে কিনা। তারপর ঐ ব্যক্তিকে তাকফীর করা হয়। যেমন বলা হলো: "এই এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার-ফায়সালা না করায় প্রেসিডেন্ট 'ক' কিংবা বাদশা 'খ' কাফের।"

এই প্রকার তাকফীর ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে হওয়াতে এতে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য হতে পারে। যেমন একজন আলেম হয়তো ভুল ব্যাখ্যা (তাওয়ীল) কিংবা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, আবার অন্য এক আলেম ক্ষমা নাও করতে পারেন(৪)। যেমন পরিপূর্ণ ভাবে নামায পরিত্যাগকারীকে কাফের বলার ব্যাপারে ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এই ধরনের তাকফীরের ব্যাপারে কেউ কেউ এর উপর আমল করতে পারে, কিন্তু কেউ কেউ হয়তো ইহা নাও মানতে পারে এবং অভিযুক্তকে মাফ করে দিতে পারে।

এই প্রকার তাকফীরের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "তাকফীরের কিছু শর্ত রয়েছে এবং এর কিছু বাধা বা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এবং শর্ত ও বাধা যাচাই না করে কোন ব্যক্তিকে তাকফীর করা যায় না। আর সাধারণভাবে তাকফীর করার ক্ষেত্রে আমরা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফীর করি না যতক্ষণ না ঐ শর্তগুলি উপস্থিত থাকে এবং বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সমূহ অনুপস্থিত থাকে।" (দেখুন: মাজমু আল ফাতাওয়া ১২/৪৮৭-৪৮৯)

ঘ) তাকফীর তাইফাতুল কুফর: (কোন দলকে তাকফীর করা) এই বিষয়টিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের ইজতিহাদের উপর ছেড়ে দেননি বরং ইহা ঈমান ও কুফরের বিষয়।

এরকম পরিস্থিতি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়ও এসেছিল যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া একদল লোক ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধীতা করেছিল। তাদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে হত্যা করা হয়, আল কোরআনে এ কাজের প্রশংসা করা হয় এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহা অনুমোদন করেন।

এই ব্যাপারে দলিল দেবার পূর্বে আমরা এই ব্যাপারে কিছু মূলনীতি আলোচনা করতে চাই। তা হলো: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে শুধু নিজের জন্যই দায়বদ্ধ করেননি, বরং সে যে দলের আনুগত্য ও সমর্থন করে, সেই দলের জন্যও তাকে দায়বদ্ধ করেন। আমরা সকল ভাই-বোনকে ইহা জানাতে চাই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তির ঈমানের ব্যাপারে দুইটি নিয়ম করেছেন। একটি হচ্ছে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে তার ঈমানের অবস্থা; আরেকটি হচ্ছে তার দল কিংবা যে দলের প্রতি তার আনুগত্য ও সমর্থন রয়েছে, যে দলের জন্য সে চেষ্টা-সাধনা করে, সময় ও শ্রম ব্যয় করে সেই দলের ঈমানের অবস্থা সংক্রান্ত।

---

(৪)যেমন একমাস আগে ইসলাম গ্রহণ করা কোন মুসলমান মুর্তিকে সিজদা দিলে কোন আলেম হয়তো তার পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাকে ক্ষমা করতে পারেন, আবার অন্য আলেম তাকে ক্ষমা নাও করতে পারেন। [অনুবাদক]

এই বিবেচনায় মানুষ চার ধরনের হয়ে থাকে:

ক) ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান এবং দলগত ভাবেও মুসলমান: এরা হচ্ছেন ঐ সকল মানুষ যারা দ্বীন ইসলামে বিশ্বাস রাখেন ও এর পাঁচটি স্তম্ভের উপর আমল করেন। তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলামের অনুসরণ করেন। এছাড়াও তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত কোন দলের জন্য কাজ করেন এবং সেটার প্রতি আনুগত্য পোষণ করেন। উদাহরণ স্বরুপ: আনসার ও মুহাজির উভয় দলের সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) গণ। কিংবা ঐসকল মুসলমান যারা এমন কোন খিলাফতের আনুগত্য করেন যা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী শাসন করে, যেখানে এমনকি যদিও খলিফা জুলুমকারী হয়, শরীয়ত তখনো পূর্ণাঙ্গ থাকে এবং মুসলমানদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। ১৯২৪ সালে খিলাফত ধ্বংসের পর থেকে আর এই উদাহরণ উপস্থিত নেই। এখন এর উদাহরণ হচ্ছে: ঐ সকল মুসলমানগণ যারা ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম পালন করছেন এবং ইসলামী শরীয়তের বিজয়ের জন্য চেষ্টা-সাধনা ও জিহাদ করছেন। এছাড়াও যারা এই সকল মুসলমানদেরকে সাহায্য করছেন, সমর্থন করছেন তারাও এই দলে পড়বেন যদিও তারা ঐ দলে শরীক হতে পারছেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন:

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَو لاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُعَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَاعَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছেন, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করাবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন। আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্যে করুন।” - সূরাহ্ আল বাকারাহ: ২৮৬

খ) ব্যক্তিগতভাবে কাফের এবং দলগতভাবেও কাফের: এরা হচ্ছে ঐ সকল লোক যারা আসল কাফের (অর্থাৎ, সে ইসলাম গ্রহন করে পরে কুফরীর মাধ্যমে দ্বীনত্যাগ করেনি, বরং পূর্বের থেকেই সে কাফের, যেমন: ইহুদী, খ্রীষ্টান ইত্যাদি) ও মুর্তাদ (যারা দ্বীন ইসলাম গ্রহন করে পরবর্তীতে বড় কুফর বা বড় শির্ক করার মাধ্যমে দ্বীনত্যাগ করেছে) হবার কারণে ইসলামের বাহ্যিক আমলগুলি সম্পাদন করে না। এর আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে: যখন কোন ব্যক্তি কোন কাফের কিংবা মুর্তাদ দলের অনুগত থাকে এবং ঐ দলের পক্ষে কাজ করে।

উদাহরণ স্বরুপ: বর্তমান মুসলমান দেশসমূহে সেনাবাহিনীগুলোতে কর্মরত ইহুদী-খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক, অগ্নি উপাসক ও দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি ইত্যাদি। কারণ মুসলমান দেশের সেনাবাহিনীগুলিও বর্তমানে ইসলামী শরীয়তের রক্ষক না হয়ে বিরোধীতা করছে – তাই এসব সেনাবাহিনী দলগতভাবে কাফের দল।

গ) ব্যক্তিগতভাবে কাফের কিন্তু দলগতভাবে মুসলমান: এর উদাহরণ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যারা বাইরে ইসলামের আনুগত্য প্রকাশ করছে কিন্তু অন্তরে মুনাফেকীর কুফর রয়েছে। এবং সে এমন একটি দলের অংশ যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুমিনদের সাহায্য করছে। কিন্তু সে এই দলটিকে ধোঁকা দিয়ে লুকিয়ে আছে যাতে ভিতর থেকে এই দলটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এজন্য সে বাহ্যিকভাবে ইবাদত-বন্দেগী করে থাকে। এই ইবাদত-বন্দেগীর কারণ হচ্ছে যাতে সে এই দলটিতে থাকতে পারে এবং তার মুনাফেকী করতে পারে, ঠিক যেমনটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল করেছিল।

বর্তমান যুগে এর উদাহরণ হচ্ছে: মুর্তাদ সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী যারা মুজাহিদীনদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য মুজাহিদ সেজে সম্মুখ সমরে যায়। এছাড়াও তারা বিভিন্ন ইসলামী আলোচনা ও মিটিং এ যোগদান করে।

তাদের স্বরুপ প্রকাশ পাবার আগ পর্যন্ত তাদের ব্যাপারটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উপর ছেড়ে দিতে হবে। আর প্রকাশ পাবার পর তাদের উপর ইসলামী হদ জারি করা হবে[৫]।

ঘ) ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান কিন্তু দলগতভাবে কাফের: এই দলের বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। ইহাকে ভালোভাবে না বুঝলে তাকফীরের ভুল প্রয়োগের সম্ভাবনা থেকে যাবে। খারেজী, তাকফীরী ও মুর্জিয়ারা এই দলের ব্যাপারে ভুল করে থাকে। এই রকম পরিস্থিতি বা দল নতুন কিছু নয়। বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এবং সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যুগেও এরকম দল ছিল যখন রিদ্দাহ্ এর ঘটনা ঘটেছিল। যখন তাতারীরা মুসলমানদের বিভিন্ন এলাকা দখল করে নিয়েছিল এবং মুসলমানরা কাফেরদের সাথে মেলামেশা করছিল সেই সময়েও এইরকম দল ছিল।

সত্যি কথা হলো: বর্তমান সময়েও মুসলমান উম্মাতের অধিকাংশের অবস্থাও তাই। ব্যক্তিগত ইবাদত ও ফরজ-ওয়াজিব পালনের ক্ষেত্রে হয়তো এসব মুসলমানদের অবস্থা ভালো হতেও পারে। এমনও হতে পারে যে সে তাহাজ্জুদ পালনকারী, হজ্জ্ব আদায়কারী। কিন্তু যারা শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, যারা মুমিনদেরকে হত্যা করছে, যারা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে বাধাপ্রদান করছে – সে ঐসব লোকদেরকে সমর্থন করে। প্রকৃত কাফের অথবা মুর্তাদদের আদর্শিক বিজয়ের আগ পর্যন্ত সে তাদের পক্ষে প্রচেষ্টা চালায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে তায়েফের ঘটনায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

যখন তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করার পরও সুদের ব্যবসা ছাড়তে রাজী হলো না, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে প্রথমে নিষেধ করলেন, কিন্তু তারা এর জবাবে তলোয়ার বের করলো এবং সুদের ব্যবসা বন্ধ করতে অসম্মতি প্রকাশ করলো। যদিও তারা কালেমা পড়তো, আযান দিতো, নামাজ পড়তো কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে একুশদিন ধরে যুদ্ধ করলেন। তিনি তাদের ঘাঁটি ঘিরে ফেললেন, তার ভিতর পাথর, আগুন ও সাপ-বিচ্ছু নিক্ষেপ করলেন যাতে তারা আত্মসমর্পণ করে – যদিও সেখানে নারী-শিশু-বৃদ্ধ ও অক্ষমরা ছিল। তাদের সবার সাথে কুফরের একটি দল হিসেবে আচরণ করা হয়েছে যদিও ব্যক্তিগতভাবে তারা নামাজ পড়তো কিংবা ইসলামের অন্যান্য বিধান মেনে চলতো। এছাড়াও যেসব মুসলমান কুরাইশ কাফেরদের সাথে অবস্থান করতো তাদের ব্যাপারে আলোচনায় আল কোরআনেও এই রকম উদাহরণ দেয়া হয়েছে। বদরের যুদ্ধের সময় ঐ সকল মুসলমানদেরকে কুরাইশরা যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য করে যারা তখনও হিজরত করেনি। এর মাধ্যমে তারা তাদের সংখ্যার আধিক্য দেখিয়ে সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ভয় দেখাতে চেয়েছিল। এসব মুসলমানদের মধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চাচা আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও ছিলেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) জানিয়েছিলেন যে, ***“বনী হাসিমের কিছু মানুষকে এই যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে, যুদ্ধের ময়দানে উনাদেরকে সামনে পেলে যেন ছেড়ে দেয়া হয় কারণ তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে।”*** একথা শুনে একজন সাহাবী বলেছিলেন: *“ওহ তাহলে আমরা আমাদের পরিবারকে হত্যা করবো আর আমাদের শত্রুদেরকে ছেড়ে দিবো, তাদেরকে হত্যা করবো না।”* রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিয়েছিলেন, ***“তোমার কি পছন্দ হবে যে, আমার চাচা আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মুখে চড় মারা হোক?”*** উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে ঐ সাহাবীকে শাস্তি দেয়ার অনুমতি চাইলেন।

কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে এসবই পরিবর্তন হয়ে যায়। এবং সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর ছোঁড়া কিছু কিছু তীর ঐ সকল মুসলমানদের গায়ে লাগে যারা বাধ্য হয়ে কুরাইশদের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। মুহাজির ও আনসার (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তখন ভয় পেয়ে বলতে থাকেন: “**আমরা আমাদের ভাইদের হত্যা করেছি**।” তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আয়াত নাযিল করেন:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرً إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَيَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَيَهْتَدُونَ سَبِيلاً

---

[৫] এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দুরার আস সুন্নিয়া, ৯ম খন্ড, মুর্তাদের ব্যাপরে হুকুম অধ্যায়ে আছে।

“যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে: এই ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ। কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, যারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।” - সূরাহ্ আন নিসা: ৯৭-৯৮

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুধু ঐ সকল দুর্বল মুসলমানদেরকে জাহান্নামের শাস্তি মাফ করে দেন যারা দুর্বল ও নিরুপায়। কিন্তু এই ঘটনায় কোন কুফরের দলকে কিভাবে দেখতে হবে, তাদের সাথে কি আচরণ করতে হবে এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। বদরের যুদ্ধের পর আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিজের ও তার ভাতিজার জন্য এই বলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে অব্যাহতি চাচ্ছিলেন যে, তারা মুসলমান। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেনঃ ***“আপনার এই যুক্তিটি বাদ দিন। আপনারা একটি যুদ্ধরত কাফের দলের সাথে এসেছেন এবং আপনাদের সাথে যুদ্ধরত দলের মতোই আচরণ করা হবে। আপনাকে অবশ্যই নিজের ও নিজের ভাতিজার জন্য মুক্তিপণ আদায় করতে হবে।”***

অন্য হাদীসে এসেছে: ***“আপনার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই আমরা আপনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবো। আপনার অন্তরের ব্যাপার আল্লাহ দেখবেন।”*** (বিস্তারিত: সহীহ বুখারীতে এই আয়াতের তাফসীর ও কিতাবুল গাযওয়া)

তারপর তিনি আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে নিজের জন্য ও তার ভাতিজার জন্য মুক্তিপণ আদায় করতে নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আয়াত নাযিল করেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًامِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيم

“হে নবী, যারা তোমার হাতে বন্দী হয়ে আছে তাদেরকে বলে দাও যে, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম মংগল চিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।” - সূরাহ্ আল আনফাল: ৭০

অতঃপর আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিশ আউন্স সোনা মুক্তিপণ হিসেবে প্রদান করেন। (বিস্তারিত: তাফসীর আল কুরতুবী, ইবনে কাসীর ও আত তাবারী)

কুফরের দল এবং ঈমানের দল চেনার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন:

الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

“যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে। সুতরাং তোমরা লড়াই করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।” - সূরাহ্ আন নিসা: ৭৬

এই আয়াত থেকে বিভিন্ন দলের ব্যাপারে তিনটি নিয়ম পাওয়া যায়:

ক) যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রাস্তায় লড়াই করে, তারা সাধারণভাবে মুমিন যদিও ঐদলে মুনাফিক থাকতে পারে। তারপরও সেটা মুমিনদের দল।

খ) যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কোন প্রতিদ্বন্দীর জন্য অথবা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন আদর্শের জন্য লড়াই করে, তারা একটি কুফরের দল যদিও সেই দলে এমন কেউ থাকতে পারে যে কাফের নয়। বাহ্যিকভাবে তাদেরকে যে রকম দেখা যায়, সে হিসাবেই দলীয় ভাবে তাদেরকে কুফরের দল গণ্য করা হবে।

গ) এসব দলের ব্যাপারে আমাদের নীতি ও আচরণ কি হবে তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। কোন দলের সাথে আমরা থাকবো, কোন দলকে আমরা সাহায্য করবো, তাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দিয়েছেন। এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বাহ্যিক দিক দেখেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলেছেন এবং এই যুদ্ধ অবশ্যই চলবে।

তাহলে ইহা সুস্পষ্ট হলো যে, যে উদ্দেশ্যে কোন দল যুদ্ধ করে থাকে, সেই উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই দলকে কুফরের দল কিংবা ঈমানদারদের দল বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদি কোন দল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আইন-বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে তবে তারা ঈমানদারদের দল। যদি তারা তাগুতের জন্য লড়াই করে তবে তারা কুফরের দল। আর ইসলামী শরীয়ত এর পরিবর্তে অন্য যে সকল কিছু বা যে সকল ব্যক্তির কাছে মানুষ বিচার-ফায়সালার জন্য যায় তারাই হল তাগুত। আর সন্দেহাতীতভাবে এই প্রকার তাগুত হচ্ছে কুফরের দল।

এছাড়াও নীচের হাদীসেও একটি দলকে ঈমান ও অন্য দলকে কুফরের দল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ***"একটি বাহিনী কাবা শরীফে যুদ্ধের জন্য আসবে। তারা যখন বাইদাহতে আসবে তখন তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে পৃথিবী গিলে ফেলবে।"*** আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), কিভাবে পৃথিবী তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে গিলে ফেলবে অথচ সেখানে কেউ কেউ থাকবে বাজারে আরও অনেকে থাকবে যারা ঐ বাহিনীর নয়।" তিনি বললেন: ***"সর্বপ্রথম ব্যক্তি থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে পৃথিবী গিলে ফেলবে অতঃপর যার যার নিয়্যত অনুযায়ী তারা আখিরাতে উঠবে।"*** (সহীহ বুখারী)

ইমাম আহমদ, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণিত হাদীসে এসেছে: ***"সেখানে তো অনেকে থাকবে যাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে।"*** রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ***"যার যার নিয়্যত অনুযায়ী তাদেরকে আখিরাতে উঠানো হবে।"*** ইমাম নাসায়ী (রাহিমাহুল্লাহ) এর বর্ণনায় এসেছে: ***"যদি তাদের মধ্যে কোন ঈমানদার থাকে তাহলে কি হবে?"*** এ থেকে বুঝা যায় যে ঐ বাহিনীটি একটি কুফরের দল যদিও এর ভিতরে কেউ কেউ ঈমানদার থাকবে।

যদিও ঐ বাহিনীটি একটি কুফরের দল কিন্তু এর ভিতরের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কাফের নাও বলা হতে পারে। ইহাই হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর সুস্পষ্ট অবস্থান, আর ইহাই দুই প্রান্তিক অবস্থানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান।

এরকম ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান দেখা যায় শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম (রাহিমাহুল্লাহ) এর নিম্নোক্ত ফতোয়ায়: (এখানে শাইখ কুফরের বিভিন্ন ধরন নিয়ে আলোচনা করছিলেন)

"তৃতীয় ভাগটি অন্তরের চিন্তাভাবনার সাথে সম্পর্কিত। ইহা ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তিকে কাফের এ পরিণত করে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। হোক ইহা দ্বীনের মূল বিষয় অথবা শাখা-প্রশাখা। তাহলে আমরা জানলাম যে, হুজ্জত (প্রমাণ) কায়েম করার আগ পর্যন্ত কাউকে তাকফীর করা যায় না। তাই এই দুই এর পার্থক্য খুবই স্পষ্ট এবং দ্বিতীয়টি নিজস্থানেই রয়েছে। কিন্তু তৃতীয়টি এক্ষেত্রে স্বস্থানে থাকলো না। অতঃপর এখানে আরও দুইটি বিষয় রয়েছে। কোন একটি কুফর কাজের ব্যাপারে হুকুম, আর ঐব্যক্তির উপর হুকুম যে কাজটি করে – দুটো আলাদা বিষয়। ...... অতঃপর আসে কোন দলের উপর তাকফীর যেমন: জাহমিয়া, সেটা আরেকটা বিষয়।" (মাজমু আল ফাতাওয়া, শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম, আল শাইখ, ১২/১৯০-১৯১; দুরার আস সুন্নিয়া ৯, ১০ ও ১১তম খন্ড)

তাই সেনাবাহিনী হোক কিংবা কোন বিভ্রান্ত দল হোক, যেমন: জাহমিয়া, যে কোন দলের উপর তাকফীরের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর মূলনীতি ইহা নয় যে, তারা কোন দলের সবাইকে একসাথে তাকফীর করেন। এমনও হতে পারে যে, সেখানে কোন নিরুপায় বাধ্যগত মুসলমান আছে অথবা সেখানে সাময়িক অর্থনৈতিক ফায়দা

হাসিল করার জন্য কোন ফাসেক মুসলমান আছে। এমনকি সেই দলে কোন ভালো মুমিনও থাকতে পারে, যে সেই দলের ভিতর লুকিয়ে আছে যাতে মুসলমানদের সাহায্য করতে পারে। যেমন: মিশর সেনাবাহিনীতে খালিদ আল ইস্তাম্বুলি[৬] (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন অথবা ফেরাউনের পরিবারের সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল কোরআনে এসেছে:

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْجَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِنيَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُوَإِنيَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَايَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

“ফেরাউন গোত্রের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখতো, সে বললো, তোমরা কি একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ, অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যাবাদিতা তার উপরই বর্তাবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তির কথা বলছে, তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর পড়বেই। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না।” - সূরাহ্ আল মুমিন ৪০:২৮

তবে এসব দুই-একটি ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থার বিবেচনায় এই দলটির কাফের হবার শরীয়তি সিদ্ধান্তে কোন পরিবর্তন আসে না। ফেরাউনের পরিবারের দুই/এক জন মূসা (আঃ) কে রক্ষার চেষ্টা করেছিল বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরাউনের পরিবারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত বদলে দেন নি।

তাই আমরা বুঝতে পারলাম যে, যারা তাগুতের জন্য মুসলমান ও মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা হচ্ছে কুফরের একটি দল। এসব শত্রুদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত কঠোরভাবে যুদ্ধ করা উচিত যতক্ষণ না তারা ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তে পরিপূর্ণভাবে ফিরে আসে। ছোট কিংবা বড় কোন ব্যাপারেই যাতে এই দল ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত না নেয়। যদিও এই দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমরা কাফের কিংবা মুর্তাদ বলি না কিন্তু এই দলের উচ্চপদস্থ নেতৃত্ব যারা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়, তাদেরকে আমরা তাগুত বলি। অপরদিকে, আমাদের মুসলমান দেশসমূহের সাধারণ মুসলমানরা বেশীরভাগই হচ্ছেন দুর্বল ও অসহায় এবং তাদের অধিকাংশই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীয়তকে পছন্দ করেন[৭]।

উপরের আলোচনা থেকে ইহাই বুঝা গেলো যে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি বা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেনি, তাদের ক্ষেত্রে কি হুকুম ছিল। কিন্তু মানুষ যে ব্যাপারটা নিয়ে সন্দেহে থাকে সেটা হলো সেনাবাহিনী। এরা হচ্ছে ঐ সকল লোক যারা সেনাবাহিনীতে সার্বক্ষনিক চাকুরী করে, তাদের দুর্বল মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করে, প্রায়ই ঐসব মুসলমানদের স্ত্রী কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের গ্রেফতার করে – যাতে তারা নিজেরা ঐসব মুজাহিদীন ভাইদেরকে সেসব মুশরিকদের কাছে হস্তান্তর করতে পারে যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার শরীয়ত বিরোধী আইন রচনা করে। আমাদের এই সম্পূর্ন ধর্মনিরপেক্ষ ও ইসলাম বিদ্বেষী সেনাবাহিনীর (মিশরের) পরিস্থিতিটা ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার। এই বাহিনীতে আছে:

ক) কিছু মুসলমান।

খ) ইহুদী ও খ্রীষ্টান।

---

[৬] এই ব্যাক্তি ছিলেন মিশরের একজন আলেম শাইখ মুহাম্মাদ ইস্তাম্বুলী (রাহিমাহুল্লাহ) এর ভাই। মিশরের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আহমদ আনওয়ার আস সাদাত এর শাসনামলে মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ) সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদে আসিন হন। তার ভাইকে সত্য প্রকাশের জন্য জেলে প্রেরণ করার কিছুদিনের মধ্যেই মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ) সাদাতকে ৬ই অক্টোবর, ১৯৮১ তে হত্যা করেন। এই নায়োকোচিত ঘটনাটি টেলিভিশনে একটি সরাসরি অনুষ্ঠান চলাকালে তিনি সম্পন্ন করেন, যার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষ প্রত্যক্ষ করে যে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ এখনও হাতের দ্বারাই সবচেয়ে ভালভাবে সম্পাদন করা যায়। অত:পর ভাই খালিদ (রাহিমাহুল্লাহ) কে তৎকালীন শাসকেরা বিচারের প্রহসনের মাধ্যমে মুবারকের ক্ষমতায়নের জন্য ঠান্ডা মাথায় খুন করে।

[৭] ইহা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যা তাকফীরী দলগুলো ভুলে যায় এবং মুসলমান দেশসমূহের সাধারণ জনগণকে কাফের/ মুশরিক মনে করে। অথচ এই দলগুলোই আবার এসব দেশকে মুর্তাদ সরকারের হাত থেকে উদ্ধার করার আহবান জানায়। এখন যদি এসব দেশের বেশীরভাগ মানুষ কাফের-মুশরিকই হয়, তাহলে এসব দেশকে মুর্তাদদের হাত থেকে মুক্ত করে লাভ কি? কারণ এসব দেশ মুক্ত করার পর তাদের দৃষ্টিতে এ সকল ‘মুর্তাদ’দের (অর্থাৎ, সাধারণ জনগণকে) হত্যা করতে হবে!! এভাবেই অজ্ঞ এবং বোকা মুসলমানদের তারা আকর্ষণীয় বক্তব্যের মাধ্যমে ধোঁকা দেয় এবং ক্ষমতার প্রলোভন দেখায়।

গ) ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে যাওয়া মানুষ।

ঘ) ফ্রিমেসন ও ফ্রিমেসনারী।

ঙ) ভাড়া করা মিলিশিয়া বাহিনী যারা ইহুদী-খ্রীষ্টানদের সাথে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ। তাদের একমাত্র শত্রুতা হলো প্রকৃত ইসলামী দলের সাথে।

ইহা হচ্ছে আসলে খারেজীদের চরিত্র যাদের সম্পর্কে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে “তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে আর মুশরিকদেরকে ছেড়ে দিবে।”

=====***=====

তাকফীরের প্রতিবন্ধকতা সমূহ কি কি?

তাকফীর করার কিছু নিয়ম-নীতির অপপ্রয়োগই খারেজী, তাকফীরী ও অন্যান্যদেরকে গোমরাহীর পথে নিয়ে গেছে। তাদের সবচেয়ে ভায়াবহ ভুল ছিল এই যে, তারা তাকফীর আল মুয়াইয়িন, তাকফীর আল ইজতিহাদ এবং তাকফীর আন নসকে ভুল বুঝেছে এবং এই তিনটি প্রকারকে এক করে ফেলেছে। তাকফীর আন নস এর বিধানটি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি, আর এই বিষয়টা শাইখ উল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ) এর “নাওয়াক্বিদুল ইসলাম” (ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ) বইটি সহ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর সকল কিতাবেই মজুদ রয়েছে। আর এই বিধানটি হলো: “যদি কোন ব্যক্তি মুশরিকদের (পৌত্তলিকদের) কুফরকে কুফর হিসেবে স্বীকৃতি না দেয় অথবা তাদের ধ্যান-ধারণা বা কুফরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, তবে সে কাফের।”

এই ধরনের লোকেরা এই বিধানটিকে এক অশুভ উদ্দেশ্যে বাড়াবাড়ি রকমের অপপ্রয়োগ করেছে। এই বিধানটিকে এই অর্থে নেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাদের ধারণা মতে ‘কাফের’ কোন ব্যক্তিকে ‘কাফের’ বলে ঘোষণা দিতে অস্বীকৃতি জানাবে, সে ব্যক্তি কাফের। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিটা প্রথম প্রকাশ পায় যখন খারেজীরা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে কাফের ঘোষণা করে এবং তারা আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কেও কাফের ঘোষণা করে, কারণ তিনি [আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)] ঐ দুই সাহাবীকে (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কাফের ঘোষণা করেননি। ইহা একটি চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি যা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর মৌলিক আকীদাকে প্রতিফলিত করে না।

এই বিধানটির সঠিক ধারণা হচ্ছে, এমন কোন ব্যক্তি যে জানে কোরআন-সুন্নাহ তে কাদেরকে কাফের সাব্যস্থ করা হয়েছে (যেমনঃ ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং মুশরিকদের) এবং সে তাদের কাফের আখ্যায়িত করতে অস্বীকৃতি জানায় বা এমনকি তাদের মুসলমান বলে ঘোষণা দেয়, তবে সেই ব্যক্তিটি কাফের। এই বিধানটি তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা ফেরাউন কিংবা আবু লাহাবের ন্যায় ব্যক্তিকে অথবা ইহুদী বা খ্রীষ্টানদেরকে (যাদেরকে কোরআনে স্পষ্টভাবে কাফের ঘোষণা দেয়া হয়েছে) মুসলমান বলে ঘোষণা দেয় কিংবা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বীন ব্যতীত অপর কোন দ্বীনকে বৈধ বলে ঘোষণা দেয় কিংবা অপর কোন দ্বীনের অনুসারীদেরকে মুসলমান বলে ঘোষণা দেয়।

ইহা ভিন্ন বিষয় যখন কারো কুফর আপনার কাছে অজানা এবং তার বিরুদ্ধে কুফরের অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে। ইহা কখনোই ঠিক নয় যে একজন মুসলমান অপর কাউকে কাফের বলতে অন্য কোন মুসলমানকে বাধ্য করবেন, যদিও তার কাছে সেই ব্যক্তির কুফর করার কোন দলিল নেই, বা যে কুফরের কথা বলা হচ্ছে সেই বিষয়েও তার কিছু জানা নেই। এমনকি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ) এবং তার পূর্বসূরী উলামাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, যখন তাঁরা কোন কাজকে কুফর বলতেন তখন ঐ কর্ম সম্পাদনকারী প্রতিটি ব্যক্তিকে তাঁরা কাফের বলে ঘোষণা দিতেন না। কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফের বলে ঘোষনা (যাকে তাকফীর আল মুয়াইয়িন বলা হয়) করার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর মতে, অবশ্যই কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। উদাহরণস্বরুপ, যখন সাহাবারা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন, ‘যাতু আনওয়াত’ (এমন এক ধরনের গাছ যেখানে মুশরিকরা তাদের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো) এর মত আমাদের জন্যও একটি ‘যাতু আনওয়াত’ এর ব্যবস্থা করুন। তখন তিনি তাঁদের কাফের বলে ঘোষণা দেননি কিন্তু তিনি তাঁদের বলেছিলেন যে, তাঁরা যা বলছেন তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও উপাস্য কামনা করার মতো ব্যাপার।(৮) যদিও এই কাজটি ছিল একটা কুফর তারপরও তাঁদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা হয়নি। কারণ হচ্ছে তাঁরা শুধু ইহার জন্য আবেদন করেছিলেন, তাঁরা কাজটি করেননি। এবং আরও একটি উদাহরণ হচ্ছে যখন মুয়ায বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শাম থেকে ফিরলেন। ইহা বর্ণিত আছে যে, মুয়ায বিন জাবাল যখন শাম অঞ্চল (বর্তমানের

---

(৮)দেখুন তিরমিজী শরীফ, হাদীস নং ২১৮০ এবং মুসনাদে আহমদ ৫ম খন্ড, হাদীস নং ২১৮

সিরিয়া, জর্দান, ফিলিস্তিন ও লেবানন) থেকে ফিরলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সিজদা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "**ইহা কি হে মুয়ায?**" তিনি বললেন, "আমি শাম অঞ্চল থেকে এসেছি আর আমি সেখানকার অধিবাসীদের তা করতে দেখি, আর আমার কাছে ইহা পছন্দনীয় যে, আমরাও আপনার জন্য এমনটি করি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন যে, "**এমনটি করো না। যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা বৈধ হত, তবে আমি নির্দেশ দিতাম যেন মহিলারা তাদের স্বামীকে সিজদা করে। তাঁর শপথ যার হাতে রয়েছে মুহাম্মাদের প্রাণ, একজন মহিলা কখনোই তার রবের হক আদায় করতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর হক আদায় করে। স্বামী যদি স্ত্রীকে পেতে চায় আর সে উনুনে থাকে তখনও সে তাকে নিষেধ করবে না।**"(৯)(১০)

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর এই গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি বোঝার জন্য প্রধান কাজ হচ্ছে এই বিষয়ে (তাকফীর) নিম্নোক্ত পার্থক্য বুঝতে পারা। যদি কোন ব্যক্তি কবরস্থানে গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে কারণ সে বিশ্বাস করে যে, ইহা একটা পবিত্র জায়গা, তাহলে এই কাজটি হারাম এবং বেদাত (নব্য আবিষ্কৃত), কিন্তু ঐ ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়নি। কিন্তু ঐ একই ব্যক্তি যদি কবরস্থানে গিয়ে কোন মৃত ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা বা দোয়া করে, তাহলে এই কাজটি হবে একটা বড় কুফর যার ব্যাপারে কোন ধরনের অজুহাতই থাকবে না। কোন বিশেষস্থানকে পবিত্র মনে করে সেখানে গিয়ে সিজদা বা দোয়া করা হারাম ও বেদাত। কিন্তু ঐ একই ব্যক্তি যদি উক্তস্থানে গিয়ে কবরস্থ লোকদের সিজদা করে বা আহবান করে তাহলে ইহা বড় কুফর হবে।

একই কথা প্রযোজ্য ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে অজ্ঞতাবশত বা ভুলবশত কোন কুফরী করেছে বা দ্বীন নিয়ে ব্যাঙ্গাত্বক উক্তি করেছে। ঐ ব্যক্তিকে কাফের বলে গণ্য করা হবে না এবং সে তার দ্বীন থেকে খারিজও হয়নি। আমরা নিম্নোক্ত হাদীসে কুদসী থেকে বিষয়টা দেখতে পারিঃ

আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, ***"আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবা করাতে ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী খুশি হন যে মরুভূমিতে তার বাহন হারিয়ে ফেলে যার উপর রয়েছে তার খাবার ও পানীয়, আর যখন সে তার বাহন খুঁজে পায় তখন সে প্রচন্ড খুশিতে বলতে থাকে, 'আল্লাহ, তুমি আমার গোলাম আর আমি তোমার রব', মানে সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে ভুল করে বসে।'***(১১)

'আল্লাহ, তুমি আমার গোলাম আর আমি তোমার রব' এই কথাটা একটা কুফরী কথা, তারপরও ঐ লোকটি তার দ্বীন থেকে খারিজ হয়নি। কেন? কারণ ইহা ছিল ভুলবশত বলে ফেলা একটা কথা। আর ইসলামে এই ধরনের কুফরকে বলা হয় কুফর আল আখতা (ভুলবশত কৃত কুফর)। কেউ হয়তো তীব্র শোক বা প্রচন্ড খুশিতে বা ক্রোধে উন্মত্ত থাকাকালে এই ধরনের কথা বলে ফেলতে পারে। ঐ মুহূর্তগুলোতে এমন কথা বলার কারণে ঐ ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে এমনটি বলা যাবে না অথবা তাকে কাফের বলে গণ্য করা যাবে না।

এই ধরনের অনেক দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলামের উলামারা '**কোন কাজকে কুফর আখ্যা দেয়া এবং ঐ কাজ সম্পাদনকারীকে কাফের ঘোষণা দেয়া**' এই দু'টি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে,

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঐ হাদীস যা এমন একজন ব্যক্তির ব্যাপারে যাকে ৩য় বা ৪র্থ বারের মত মদ্যপানের জন্য বেত্রাঘাত করা হয়। তখন একজন সাহাবী তাকে অভিসম্পাত করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ সাহাবীকে এমন করতে বারণ করেন এবং তাকে বলেন যে, ***"তাকে এরুপ বলো***

---

(১০)মুয়ায (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শাম অঞ্চলে বসবাস করছিলেন এবং সেখানকার অধিবাসীরা তাদের পাদ্রী ও যাজকদের সম্মানার্থে সিজদাবনত হত। স্বাভাবিকভাবে, তিনি চিন্তা করলেন যে, আমরা কেন আমাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মানার্থে এরুপ করবো না। এই সিজদা করার বিষিয়টা ইবাদতের অর্থে ছিল না, বরং তা ছিল সম্মান জানানোর অর্থে। আর একই কথা প্রযোজ্য ইউসুফ (আঃ) এর বাবা মায়ের জন্যও যখন তাঁরা দুইজন ও ইউসুফ (আঃ) এর অপর ভাইয়েরা তাঁকে [ইউসুফ (আঃ)] কে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য সিজদা করেছিল। ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যদি কোন ব্যক্তি ইবাদতের উদ্দেশ্যে অপর কোন ব্যক্তিকে সিজদা করে, তাহলে তা হবে একটি বড় শিরক (শিরক আল আকবর) ও একটি বড় কুফর (কুফর আল আকবর), আর এর জন্য কোন ধরনের ওজরও প্রযোজ্য নয়। কিন্তু ইহা বুঝতে হবে যে, বেদাত থেকে বা অজ্ঞতা থেকে কৃত কাজ এবং আল্লাহ ব্যাতীত অন্য কারো ইবাদতের উদ্দেশ্য নিয়ে কৃত কাজের মধ্যকার পার্থক্য রয়েছে।

(১১)সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাওবা, হাদীস নং ৪৯৩২।

না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কে ভালোবাসে।”[১২] যদিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাধারণভাবে মদ্যপান সংশ্লিষ্ট দশটি কাজকে অভিশাপ দিয়েছেন, তিনি নির্দিষ্টভাবে এসব কাজ সম্পাদনকারী একজন ব্যক্তিকে অভিশাপ দিতে অনুমতি দেননি। এইসব ও অন্যান্য আরও দলিল-প্রমাণ, কোরআনের আয়াত ও সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ঐ সংক্রান্ত কোরআনের আয়াত ও হাদীসের বুঝ থেকে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ তাকফীরের প্রতিবন্ধকসমূহ চিহ্নিত করেছেন।

উপরে বর্ণিত এই সকল দলিল-প্রমাণ অনুযায়ীই তাকফীরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে যার সাপেক্ষে একজন মুসলমানকে ততক্ষণ কাফের আখ্যায়িত করা থেকে বিরত থাকা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে হুজ্জত (বা প্রমাণ) প্রতিষ্ঠিত না হয়। ইহা এই কারণে যে, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর কর্মপন্থা হচ্ছে খারেজীদের বিপরীত, যারা সবাইকে কাফের মনে করে (এমনকি একজন মুসলমানকেও) যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা (যাদের কাফের বলা হচ্ছে) উল্টোটা প্রমাণ করে। আমরা ঐসকল লোকদের মুসলমান হিসেবে গণ্য করি যারা নিজেদের মুসলমান হিসেবে দাবী করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এর বিপরীত কোন কারণ থাকে। তাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ নিম্নোক্ত প্রতিবন্ধকতা সমূহের ব্যাপারে একমত হয়েছেন:

১. যে কাজের জন্য তাকে কাফের বলা হচ্ছে তা যে কুফর এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকবে না এবং শুধুমাত্র লোকেরা সেই কাজকে কুফর ভাবে এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না।

২. উক্ত ব্যক্তিটি সুস্থ স্বাভাবিক হতে হবে। অপ্রকৃতস্থ হবে না।

৩. তার কৃতকর্মের ব্যাপারে তার জ্ঞান থাকতে হবে বা জানার সুযোগ থাকতে হবে।

৪. উক্ত ব্যক্তিটি এই কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে।

৫. সে উক্ত কাজ ঘুমন্ত অবস্থায় করেনি।

৬. সে কাজটি স্বাধীনভাবে করেছে, তার উপর কোন জোর জবরদস্তি করা হয়নি এবং ঐ ব্যক্তিটি উপরের বিষয়গুলোর বিপরীত নয়।

৭. বিষয়টি এমন হওয়া যাবে না যে, দায়ী ব্যক্তি ব্যাপারটির অন্য কোন ব্যাখ্যা করেছে এবং সে তা এই ভেবে করছে যে সে মনে করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সে এমনটি করেছে। এই বিষয়টা আলাদাভাবে উল্লেখ করা খুব জরুরি এজন্য যে, যে ব্যক্তি এমন কাজ করছে সে আসলে ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছে। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ তাদের তাকফীর করে না যদিও তাদের কৃত কাজ কুফর। এর কারণ এই যে, এদের অনেকেই সঠিক ব্যাখ্যা বা বুঝের ব্যাপারে অজ্ঞ কিংবা বাতিল উলামা দ্বারা ভুল পথে ধাবিত। তাদের কিছু কিছু নেতা বা আলেমরা লোকদের এইসব মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপারেও মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়।

ঠিক এজন্যই শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ) যিনি আমাদের সময়ে এই নীতিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাদেরকে কাফের ঘোষণা দেননি যারা তার সময়ে কুবলাতুল কাওয়াজ নামক স্থানে আল্লাহর কাছে দোয়া করত। তিনি ঐ অবস্থার প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন এবং তিনি ঐ অবস্থার পরিবর্তন করেন। এর কারণ এই যে, তৎকালীন বাতিল আলেমরা বিভিন্ন হাদীস উদ্ভাবন করতো, যাতে মানুষদেরকে তারা এই সমস্ত বেদাতকে হালাল বলে ধারণা দিতে পারে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) তাকফীরের প্রতিবন্ধকতা ও শর্তসমূহ নিয়ে বলেন যে,

“তাকফীরের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে ও কিছু প্রতিবন্ধক রয়েছে। এবং ইহা (তাকফীর) সাধারণভাবে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে না। যখন আমরা সাধারণভাবে তাকফীর করি, এর মানে এই নয় যে, আমরা কোন

---

[১২] সহীহ বুখারী খন্ড ৮, হাদীস নং ৭৭১।

একজন ব্যক্তিকে কাফের বলে ঘোষণা দেই। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে ইহা তখনি প্রযোজ্য হবে যখন এই শর্তসমূহ সেখানে বিদ্যমান থাকবে এবং এই প্রতিবন্ধকতাসমূহ সেখানে আর উপস্থিত থাকবে না।”(১৩)

তাহলে উপরে বর্ণিত তাকফীরের প্রতিবন্ধকতাসমূহের ঠিক বিপরীত হচ্ছেঃ

১. কাজটি যে কুফর এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই।

২. ঐ ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য রয়েছে আর তার বিচার বুদ্ধির ক্ষমতা রয়েছে।

৩. তার কৃতকর্ম সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অবগত।

৪. সে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাজটি সম্পন্ন করেছে, কোন দুর্ঘটনাবশত নয়।

৫. উক্ত ব্যক্তিটি জাগ্রত অবস্থায় কাজটি করেছে, ঘুমন্ত অবস্থায় করেনি।

৬. উক্ত ব্যক্তিটি কোন ধরনের জোর জবরদস্তির শিকার হয়নি।

৭. ঐ ব্যক্তির কাছে তার কাজের এমন কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা (তাওয়ীল)(১৪) নাই যা তার কুফরী কাজকে যথার্থ বলে সাব্যস্ত করবে।(১৫)

যখন এই শর্তগুলো পূরণ করা হবে, কেবল এবং কেবল মাত্র তখনি আমরা কুফর আল মুয়াইয়িন (কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফীর) আরোপ করতে পারবো। ইহা এভাবে বলা যেতে পারে,

‘সুস্পষ্ট কুফর এবং সুস্পষ্ট কাফের এর মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য রয়েছে। ইহা এভাবেও বলা যেতে পারে, প্রতিটি কুফরী কাজই একজন কাফের ব্যক্তি করছে এমন বলা যাবে না। কিন্তু প্রতিটি কাফেরই নিশ্চিতভাবে কুফরী করেছে!’

সংক্ষেপে ইহাই হচ্ছে নিয়ম। এই সীমারেখার বাইরে যারা যাবে বা যাচ্ছে তারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। খারেজীদের বিপর্যস্ত-বিভ্রান্ত আচরণ থেকে আমরা এইমাত্র যা শিক্ষা পেলাম সে বিষয়ে আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত।

=====***=====

---

(১৩)মাজমু আল ফাতওয়া, খন্ড ১২, পৃষ্ঠা নং ৪৮৭-৪৮৯।

(১৪)তাওয়িল হচ্ছে কোরআন বা সুন্নাহ থেকে নেয়া যা বোধগম্য হয় এমন ব্যাখ্যা।

(১৫)এই বিষয়গুলোর উপর আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য “Allah’s Governance on Earth” বইটি ও তার অডিও টেপ দেখুন।

তাকফীর ও মুমিনদের প্রতি সন্দেহ

বর্তমান যুগের একটি রোগ হল গণতন্ত্র। এখন ইহা সবচাইতে ব্যাপক অসুস্থতাগুলোর মধ্যে অন্যতম, যা এমন প্রত্যেককে ধ্বংস করছে, যারা এতে অংশগ্রহণ করছে তারা ইহাকে ত্রাণকর্তারূপে গ্রহন করছে। সম্প্রতি ঈমানদারগণ আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, যেহেতু কিছু আলেম ইসলামী শাসন ব্যবস্থা এবং গণতন্ত্রকে সমার্থক বলে ঘোষণা করেছে। ঈমানদারগণ দ্বিধার সঙ্গে এসকল কর্তৃত্বকে মেনে নিয়েছে এবং ব্যালটবক্সে তাদের ভোটপ্রদান করেছে, আর সেই সাথে এই বিশ্বাস নিয়ে তাদের থেকে অনেকে পার্লামেন্টে (সংসদে) প্রবেশও করেছে যে, তারা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধে অংশগ্রহন করছে।

যারা মুর্জিয়া আকীদার অনুসারী, তারা এই সুযোগে উদ্বেলিত হয়েছে এবং তাদের মুখ হা করে এগিয়ে এসেছে গণতন্ত্রের ধাত্রীদের থেকে শির্‌ক-এর নষ্ট দুধ পান করার উদ্দেশ্যে। যারা তাকফীরী আকীদার অনুসারী, তারা ঘটা করে এই ঘোষণা করছে যে, **‘যারা ভোট দেয় এবং সেই সাথে যারা পার্লামেন্টে (সংসদে) প্রবেশ করে, তারা সবাই একবাক্যে কাফের।’** এর ফলাফল স্বরূপ ইন্দোনেশিয়ান মুসলমানদের উপর তাকফীর হয়েছে, আর সেই সাথে সেসকল বিভ্রান্ত মুসলমানদের উপরেও, যারা হয়তো কোন এম.পি অথবা অপর কোন সরকারী প্রতিনিধিকে ভোট দিয়েছে। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে যা করা উচিত, তা হলো আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামাহ্ এর মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এই দু'টি বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর মাঝে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান সুস্পষ্ট করে তোলা। ইহা এই বাস্তবতার কারণে যে, বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে একজন ভোটারের উপর হুকুম ঠিক সেরূপ নয়, যেরূপ হুকুম একজন শাসকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং, ইহার সংশোধন ও বিশদ বর্ণনা জরুরি। তাই আমরা এ বিষয়কে দুইটি ভাগে ভাগ করবো,

ক. যে পার্লামেন্টে (সংসদে) যোগদান করে, তার ক্ষেত্রে হুকুম।

খ. যে একজন ভোটার অথবা ভোট দেয়ার ব্যাপারে চিন্তা করছে, তার ক্ষেত্রে হুকুম।

যে পার্লামেন্টে (সংসদে) যোগদান করে, তার ক্ষেত্রে হুকুম

যারা পার্লামেন্টে (সংসদে) প্রবেশ করে, তাদের বিষয়টি আমাদের সময়ে একটি বিশাল বিতর্কের বিষয় এবং ধীরে ধীরে ইহা আরও উত্তপ্ত একটি বিতর্কে পরিণত হচ্ছে। এই বিষয়টি আমাদের কাছে এই বাস্তবতার আলোকে এসেছে যে, বর্তমান সময়ে কোন খিলাফত নেই এবং মুসলমানরা কর্তৃত্বের সাথে পৃথিবীতে শাসন করছে না। যা ঘটেছে তা হলো, গণতন্ত্র আজ রাত্রির অন্ধকারে একটি কালো পাথরের উপর দিয়ে হেটে যাওয়া একটি কালো পিঁপড়ার চাইতেও অস্পষ্ট বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম (রাহিমাহুল্লাহ) এবং আল্লামাহ্ আহ্‌মদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ) এর সময়কালীন মুসলমান ভূখন্ড সমূহে মুসলমানদের মাথার উপরে অন্যান্য মানবরচিত বিধিবিধান এবং পার্লামেন্টারী (সংসদীয়) ব্যবস্থা তৈরী এবং প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এই দুইজন আলেম ইহার কঠোর ও রূঢ় জবাব দিয়েছিলেন এবং সেই সিস্টেমের বিরুদ্ধে তাদের সর্বাত্মক শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। যারা কুফর সম্পাদন করছিল এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রাস্তায় বাধা দান করছিল, তাদেরকে কুফরের গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

যাহোক, তাদের প্রত্যেকে সেই কুফর করছে না, যা একজনকে ইসলামের বহির্ভূত করে। তাদের ক্ষেত্রে সেই একই হুকুম প্রযোজ্য, যা একটি কুফর গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তাদেরকে বলা হয় “মালা” (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ)। ইহা আল কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আমরা প্রচুর দলিল পেশ করেছি। ইহাই তাদের কে বলা হয়, তারা পছন্দ করুক বা না করুক। যেমন:

قَالَ الْمَلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (١٠٩)

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (১১০)

“ফেরাউনের কওমের মালা (উচ্চপদস্থ প্রদানগণ/সর্দারগণ) বললো, ‘নিশ্চয়ই এ অবশ্যই একজন বিজ্ঞ জাদুকর, সে তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে চায়, এখন তোমরা কি আদেশ করো?’” – সূরাহ্ আল আরাফ: ১০৯-১১০

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (৩২)

“সে (বিলকিস, সাবা এর রাণী) বললো, ‘ও হে মালা (মানুষদের থেকে প্রধানগণ), তোমরা আমাকে ফতোয়া দাও এ ব্যাপারে।’” – সূরাহ্ আন নাম্‌ল: ৩২

যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরাউন এবং মালা এর কথা উল্লেখ করেছেন, ইহা ছিল মন্ত্রী, এমপি এবং পার্লামেন্টের (সংসদের) লোকজন, যাদের ব্যাপারে তিনি এই আয়াতে বলছিলেন। এমনকি শাইখগণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যখন পার্লামেন্টে (সংসদে) যান, তখন তারাও এই দৃশ্যের একটি অংশে পরিণত হন। হয় তারা প্রতারক অথবা তাওহীদের ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান ততটা ব্যাপক/গভীর নয়। যেমনটি আমরা অনেক দেশে দেখতে পাই যে, যেসব দেশের মানুষদের হাদীস, ফিক্বহ ইত্যাদির ব্যাপারে ব্যাপক জ্ঞান রয়েছে, তারাই আকীদাগত দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে ভুলের মধ্যে থাকে। ইহা শুধুমাত্র ইহাই প্রমাণ করে যে, ইল্‌ম/জ্ঞানের একাংশে উত্তম হলেই তাতে অপরাংশ অর্জিত হয় না।

এভাবে, সমগ্র পার্লামেন্ট (সংসদ) ই হলো একটি কুফরগোষ্ঠী, তবে পার্লামেন্টের (সংসদের) সকলেই কাফের নয়। এখানে,

প্রথমত: সেখানে এরূপ লোকেরা আছে, যারা গণতন্ত্রকে একটি আইনের সরাসরি উৎস হিসেবে বিশ্বাস করে অথবা বৈধ আইনের উৎস হিসেবে বিবেচনা করে অথবা তারা হয়তো এসব বিশ্বাস করে না কিন্তু তারা ইহা দিয়ে আইন প্রণয়ন করে। এই লোকেরা কাফের, তারা অন্যান্য যত কিছুই করুক না কেন। তারা যত ইবাদতই করুক না কেন, অথবা তারা যতবারই হজ্ব করুক না কেন, এর মাধ্যমে তারা ইসলামের এক ইঞ্চি কাছেও আসতে পারবে না, যেহেতু এধরনের কাজ তারা করছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করেছেন, শুধুমাত্র তাদের পার্লামেন্টে (সংসদে) উপস্থিতির কারণে, তাদের গণতন্ত্রের প্রতিরক্ষার কারণে এবং তাদের গণতন্ত্রের প্রচারের কারণে।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।” - সূরাহ্ আল মায়িদাহ: ০৩

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেছেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“আর যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করে, কখনো তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না; আর আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।” - সূরাহ্ আলি ইমরান: ৮৫

আমরা আবারও জোর দিয়ে বলছি যে, এই লোকেরা কাফের এবং তাদেরকে কোনভাবেই অনুসরণ বা গ্রহন করা যাবে না, কোন আকারে বা কোন অবস্থাতেই নয়।

দ্বিতীয়ত: এরূপ লোকেরা, যারা চালাকির শিকার অথবা তাদের ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে বা তাদের দ্বারাই ভুল ব্যাখ্যা সূচিত হয়েছে। তারা জানে যে গণতন্ত্র হলো কুফর এবং ইহা ইসলামে হারাম। তারা ইহাকে আইন প্রণয়নের

মাধ্যমে ধীরে ধীরে শরীয়তকে অপসারিত করার একটি মাধ্যম হিসেবে দেখে। তারপর এসব লোকেরা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা নিজেরা কোন প্রকার আইন প্রণয়ন না করে আইন প্রণয়নের প্যানেলে অংশগ্রহণ করবে, যেন তারা এমন যে কোন ধরনের আইন প্রণয়ন বন্ধ করতে পারে, যা শরীয়তের বিরুদ্ধে যায়।

যা ঘটেছে, তাহলো, এসকল লোকদেরকে একটি বিশেষ ধরনের তাওয়ীল (ব্যাখ্যা) দেয়া হয়েছে বা তারা করেছে। যে ব্যাখ্যাটি তারা বুঝেছে, তা দুইটি দলিলের উপর ভিত্তি করে হয়েছে। প্রথমটি হলো সেই ব্যক্তি, যে ফেরাউনকে বলেছিল,

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

“একজন মুমিন পুরুষ – যে ছিল (স্বয়ং) ফেরাউনের গোত্রেরই লোক, এবং যে নিজের ঈমান (এতদিন) গোপন করে আসছিল, (সবশুনে) বললো, (আচ্ছা), তোমরা কি একজন লোককে শুধু এজন্যই হত্যা করতে চাও যে, ব্যক্তিটি বলে আমার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা, অথচ সে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ সহই তোমাদের কাছে এসেছে; যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার এই মিথ্যা তো তার ওপরেই (বর্তাবে), আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে যে (আযাবের) ব্যাপারে সে তোমাদের কাছে ওয়াদা করছে তার কিছু না কিছু তো এসে তোমাদের পাকড়াও করবে; অবশ্যই আল্লাহ তাআলা এমন লোককে সঠিক পথ দেখান না, যে সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদী।” - সূরাহ্ আল মুমিন: ২৮

আসুন, এই আয়াতটি বুঝা যাক। এখানে, ফেরাউনের পরিবার থেকে একজন ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে, যিনি সৎ কাজের আদেশ দিচ্ছেন এবং অসৎ কাজের নিষেধ করছেন, এবং তিনি ছিলেন ফেরাউনের সভাসদ। এই সভায় ছিল ফেরাউন, হামান এবং কারুন। ফেরাউন ছিল অবশ্যই শাসক এবং আইনপ্রণেতা, সেই সাথে কারুন ও হামান ছিল শাসনব্যবস্থার মন্ত্রী, এভাবে তারা ছিল সহকারী আইনপ্রণেতা। এমনকি এই বাস্তবতার পরেও, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই ঈমানদার ব্যক্তিটিকে ঈমানদার বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ ব্যক্তিটি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করার চেষ্টা করছিলেন এবং তিনি আইন প্রণয়নকারী ছিলেন না। কিন্তু, তিনি তার ঈমান প্রকাশ করার পূর্বে বাহ্যিকভাবে কুফর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এরপর যখন ওহী আসলো, আমরা জানতে পারলাম যে তিনি একজন ঈমানদার ছিলেন। আমরা এই আয়াতটি ব্যবহার করে এরূপ বলি না যে, যারা কুফর গোষ্ঠীতে রয়েছে তারা পরিপূর্ণ ঈমানদার, কিন্তু আমরা এই আয়াতটি ব্যবহার করি ইহা দেখানোর জন্য যে, আমরা পার্লামেন্টের (সংসদের) প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষকে কাফের বলতে পারি না, যেহেতু সেই ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ করার বহুপূর্বে তাকে সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। উপরের আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিটি তাদের আইন প্রণয়ন বন্ধ করতে চেয়েছিল, যা ছিল মূসা (আঃ) কে হত্যা করা, যা দেখা যায় একই সূরাহ্ এর ২৪-২৬ আয়াতে। এই ঈমানদার ব্যক্তিটি এরূপ করছিলেন যখন তিনি প্যানেলে ছিলেন এই ব্যাখ্যা নিয়ে যে, তিনি হয়তো বিষয়াদি পরিবর্তন করতে পারবেন। এই ধরনটি হয়তো তার মতই দেখায়, যে পার্লামেন্টে (সংসদে) প্রবেশ করে এবং সে আইন প্রণয়ন করে না। তাকে ঠিক সেই ঈমানদার ব্যক্তিটির ন্যায়ই করতে দেখা যায়, যদিও ঈমানদার ব্যক্তিটি ছিলেন ফেরাউনের আত্মীয়। যে ব্যক্তিটি পার্লামেন্টে (সংসদে) প্রবেশ করে, সে আইন প্রণেতাদের প্যানেলে বসছে এবং সে হারাম আইন প্রণয়ন বন্ধ করতে চাইছে।

এই কারণে ঈমানদার হিসেবে, আমরা লাফিয়ে পড়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বে সন্দেহের কারণে সুযোগ দেয়ার চেষ্টা করি। আমাদের ইহা ভুলে যাওয়া চলবে না যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ব্যক্তিটিকে, যিনি তার ঈমানকে লুকিয়েছিলেন, তাকে ঈমানদার বলেছেন। তাহলে তাদের ব্যাপারটি কিরূপ, যারা ঘোষণা দেয় যে, তারা ঈমানদার এবং গণতন্ত্র হলো কুফর, এবং তারা আইন প্রণয়নে এই কুফর বন্ধের চেষ্টায় লিপ্ত? তাদের কি আরও বেশী সুযোগ পাওয়া উচিত নয়? যদিও আমরা এই পদ্ধতির সাথে একমত পোষণ করি না এবং আমরা ইহাও বিশ্বাস করি না যে, তাদেরকে আমরা যে সুযোগ দিচ্ছি তার জন্য এক সেকেন্ডের জন্যও জিহাদে বিলম্ব করা উচিত। ইহা শুধু এই বাস্তবতার কারণে যে, আমরা জানি যে, তাদের এই কর্মপদ্ধতি একটি চোরাগলি এবং ফিত্না বন্ধ করার জন্য কর্মপদ্ধতি হিসেবে জিহাদের আদেশটি মুজাহিদীনদের কাছে সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ এবং সত্য হিসেবে প্রমাণিত।

পরবর্তী যে ঘটনাটি তারা বর্ণনা করে, তাহলো যখন নবুয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল কাফেরদের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, যেখানে ছিল যে, কারো প্রতি কোন প্রকারের আগ্রাসন ও অন্যায় হবে না। ইহা ঠিক সেই ঘটনাটির কিছু পরেই সম্পাদিত হয়েছিল, যেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে কালো পাথরটি কাবাতে স্থাপন করতে সাহায্য করেছিলেন। এই চুক্তিটিকে বলা হত **হিলফুল-ফুযুল** (উন্নতির জন্য মৈত্রী বন্ধন)(১৬)। পরবর্তীতে যখন তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দ্বারা নবী হিসেবে নিযুক্ত হলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই চুক্তিটি অব্যাহত রাখলেন, এ কথা বলে যে, **“আমি একটি মৈত্রী বন্ধনের অংশ ছিলাম, যা আমি কোন কিছুর সাথে বিনিময় করতে এখন চাই না।”**(১৭)

যদিও এই মৈত্রীবন্ধনটি আর কেউ নয়, বরং কাফেরদের সাথেই ছিল, এবং যেহেতু এর ফলাফল এবং এতে সম্মিলিত হওয়ার কারণ ইসলাম বিরোধী ছিল না, এই কারণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহা নবুয়্যাত প্রাপ্তির পরও অনুমোদিত করেছিলেন। যাহোক, যারা গণতন্ত্রে অবিশ্বাস করা সত্ত্বেও পার্লামেন্টে (সংসদে) প্রবেশ করে তারা এর আরেকটি ব্যখ্যা দিতে চায়। তারা এর সাথে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চুক্তি থেকে আসা ফলাফলের কিছু মিল খোঁজার চেষ্টা করে। তারা বলে, যদি এই মৈত্রীবন্ধনটি একটি কুফরী কাজ হয়ে থাকতো অথবা কাফেরদের সাথে কোন কিছুর ব্যাপারে বিচার-সিদ্ধান্ত করার জন্য বসা যদি কুফরী কাজ হয়ে থাকতো, তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে বসতেন না। কারণ সকল নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) জন্মগতভাবে সকল প্রকার কুফ্র ও শির্ক থেকে পবিত্র। সুতরাং, ইহা থেকে তারা বলতে চান যে, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য কাফেরদের সাথে বসার মধ্যে কোন কুফর নেই অথবা স্বয়ং ইহা কোন কুফর নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা শরীয়ত এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তাদের মধ্যে কোন কোন পার্লামেন্ট (সংসদ) সদস্য যারা এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছে, তারা পার্লামেন্টের (সংসদের) আলোচনাকে শরীয়ত এর দিকে ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

আমরা আবারও বলছি যে, আমরা এরূপ পদ্ধতির সাথে একমত নই। কিন্তু তাদের এই ভুল ব্যখ্যা বা তাওয়ীল তাকফীরের প্রতিবন্ধক হিসেবে যথেষ্ট। এই তাওয়ীলের কারণে ‘তারা সর্বতোভাবে কোন ব্যতিক্রম ব্যতীত কাফের’, এ রকম কোন বোকামিপূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেয়া যায় না।

যারা একটি ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছে তাদের ক্ষেত্রে সন্দেহের সুযোগের আরেকটি পথ হলো, তারা যুক্তি দেখাবে যে, তারা পার্লামেন্টে (সংসদে) অংশগ্রহণ করছে এই কারণে যে, তারা সরকারকে বলবে যে, তারা মানুষের সিংহভাগের প্রতিনিধিত্ব করছে। আর যেহেতু সরকার বলছে যে, গণতন্ত্রে বসবাসরত মানুষেরা তাদের নিজেদের বিষয়াদি নির্বাচন করতে সক্ষম, তারা সরকারকে শুধুমাত্র তাই বলবে যা মানুষেরা চায়, আর মানুষেরা যা চায় তা হলো শরীয়ত। যারা পার্লামেন্টে (সংসদে) প্রবেশ করছে, তারা হলো এমন মানুষ, যারা চায় যেন শাসন একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য নির্দিষ্ট হয়। এসকল লোকেরা তাদের নিজস্ব ঔষধ ব্যবহার করে কুফরকে লজ্জায় ফেলতে চাইছে।

এরূপই হয়েছিল আলজেরিয়ার ক্ষেত্রে, যখন তাদেরকে ভোট দেয়া হয়েছিল। আর যখন তারা শরীয়তের প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্রের ধ্বংসের পক্ষে ভোট দিল, তখন বাতিল আইন প্রণেতারা ক্রুদ্ধ হয়ে পড়লো।

যা হোক, নির্বাচনটি কাজ করেনি, যদিও ৯৮% মানুষ শরীয়ত চেয়েছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বলেছেন যে, এই ফিত্না পরিবর্তনের জন্য তিনি আমাদের থেকে একমাত্র যা চান, তাহলো যুদ্ধ, আপোস নয়।

---

(১৬)কিন্তু এ সকল মানুষদের অবশ্যই কোন যুদ্ধরত মুজাহিদ বাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক হওয়া যাবে না, যখন কিনা তারা পার্লামেন্ট (সংসদে) এ থাকে। এর কারণ হলো মুজাহিদীনদের রক্ত আর জিহাদের মূলনীতি অবশ্যই সে সকল লোকদের হাতে থাকা যাবে না, যারা কিনা প্রতারক অথবা বোকা। যদি আমরা তাদেরকে সুযোগ দিয়ে থাকি, এর মানে এই নয় যে, আমরা তাদেরকে ঈমানদারদের নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছি। আমরা তাদেরকে বলবো যে, তাদের সঠিক কাজ হলো মুজাহিদীনদের সাথে যোগদান করা। এফ.আই.এস এর আর্মি লীডাররা যখন সরকার এর সাথে আলোচনা-পরামর্শ করলো তখন যা হয়েছে তা একটা খুবই ভালো উদাহরণ যে, যখন তুমি যুদ্ধে হেরে যাও, তখন যা যা কিছু তোমার পাওয়ার কথা ছিল, তুমি তার সবই হারাও, একটা কুফর আইনও ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি। তথাকথিত ইসলামিক আর্মি এফ.আই.এস নিজেদেরকে সেই ভূখন্ডের সরকার এর হাতে তুলে দিয়েছিল কোন ইসলামিক কারণ ব্যতীতই। যে কোন যোদ্ধার জন্য এ সকল সরকার এর সাথে আলোচনা-পরামর্শকারী কারো পরামর্শ গ্রহন করা বড় পাপ। ইহা সব মিলিয়ে একটা ভিন্ন যুদ্ধ।

(১৭)ইবনে হিশাম, ইবনে কাসীর, ইবনে ইসহাক এবং অন্যান্যদের রচিত সীরাহ-এর বইগুলো দেখুন।

এই পয়েন্টটি জোরদার করার জন্য, এই লোকেরা প্রকৃতপক্ষেই সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন যে, তারা পার্লামেন্টে প্রবেশ করবেন, কোন প্রকার আইন তৈরী করবেন না, কিন্তু যখনই কোন নতুন আইন আসে, তারা ইহা প্রত্যাখ্যান করবেন। যদিও এর নিয়্যতটি প্রশংসনীয়, কিন্তু ইহা একটি বড় হারাম এবং একটি কবীরা গুনাহ, যা তারা করছেন।

আর কখনো কখনো এই হারামটি কুফরও হতে পারে, যদিও ইহা ভালো নিয়্যতের দ্বারা শুরু হয়। বিষয়টি এরূপই হয়ে থাকে বিশেষ করে যখন এসকল লোকেরা, যারা পার্লামেন্টে (সংসদে) প্রবেশ করেন, তারা এসকল প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগদান করার ফলে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ ভোগ করতে থাকেন, যেমন: বেতন পাওয়া অথবা রাজনৈতিক নিরাপত্তা পাওয়া, ইত্যাদি। এধরনের রাজনৈতিক নিরাপত্তা লাভের মাধ্যমে তারা যে অবস্থান লাভ করেন, তা বড় হারাম অথবা বড় কুফর হতে পারে। এর কারণ হলো ইহাকে এরূপে দেখা যায় যে, আপনি কাফেরদের সাথে মৈত্রীতে লিপ্ত হচ্ছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

"আল্লাহ তাআলা (ইতিপূর্বেও) এই কিতাবের মাধ্যমে তোমাদের উপর আদেশ নাযিল করেছিলেন যে, তোমরা যখন দেখবে (কাফেরদের কোন বৈঠকে) আল্লাহ্ তাআলার নাযিল করা কোন আয়াত অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে (এধরনের মজলিসে) বসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা অন্য কোন আলোচনায় লিপ্ত হয়। (এমনটি করলে) অবশ্যই তোমরা তাদের মতো হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল মুনাফিক ও কাফেরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" - সূরাহ্ আন নিসা: ১৪০

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই আয়াতে তাদেরকে কাফের এবং মুনাফিক বলেছেন, যদিও তাদের মধ্যে কতক ঈমানদার রয়েছে। তবুও তারা কুফরের গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে। তাদের মধ্যে যারা মুনাফিক, কিন্তু এই জীবনে তাদেরকে মুসলমান হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তারা বিচার দিবসে তাদের কাফের প্রতিপক্ষের সাথে থাকবে,(১৮) কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানতেন যে, তাদের বড় নিফাক রয়েছে এবং তাদের ইসলাম হলো নিছক প্রদর্শনী। যেহেতু এই কাজটি প্রকৃতপক্ষে কুফর এবং নিফাকের মাঝে ঘুরছে, পার্লামেন্টে (সংসদে) প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষকে কাফের না বলাই ভালো। এর মাধ্যমে আপনি যারা গণতন্ত্রের প্রচার-প্রসার করছে না এবং যারা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই কুফরকে বন্ধ করার চেষ্টা করছে তাদেরকে সন্দেহের অজুহাতে রেহাই পাওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন। এখন ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এর মানে এই নয় যে, আমরা এই পদ্ধতির সাথে একমত অথবা আমরা বলি যে, ইহা সঠিক কাজ, কারণ একমাত্র সঠিক কাজ হলো:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিত্না (শির্ক) শেষ হয়ে যায় এবং দ্বীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" - সূরাহ্ আল আনফাল: ৩৯

আমরা এরূপ পরামর্শ দেই না যে, আমরা তাদের প্রত্যেককে কাফের বলার মাধ্যমে তাদের রক্তের অমর্যাদা ঘটাবো, কিন্তু তারা একটি কুফরের গোষ্ঠী। তাদের সকলে, যারা প্রতারক, যারা কাফের, যারা মুরতাদ, তাদের ভবনসমূহ এবং আরও অন্যান্য সবকিছুই ঈমানদারদের জন্য একটি টার্গেট, যা ঈমানদারদের দ্বারা সংঘটিত প্রচন্ড আক্রমণের সম্মুখীন হতে পারে, এবং এই ভবনের (যেখানে আইন প্রণয়ণ হচ্ছে, যেমন: সংসদ ভবন) ছাদের নীচে বসবাসকারী প্রত্যেককে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে পাঠিয়ে দেয়া যেতে পারে (হত্যা করা যেতে পারে) আর তাদের নিয়্যত অনুসারে আল্লাহ তাদের বিচার করবেন।

---

(১৮)তাই যারা পার্লামেন্ট (সংসদ) এ প্রবেশ করে তাদের সকলকে এই আয়াতের রায় অনুসারে কাফের বলা যাবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে কাফের ও মুনাফিক বলে সম্বোধন করেছেন, এভাবে তাদের মাঝে একটি দাগ টানা হয়েছে। এভাবে এই জীবনে আমরা তাদেরকে ইসলাম প্রদর্শন করতে দেখি, কিন্তু ভিতরে গোপন রয়েছে নিফাক, আমরা তাদেরকে কাফের বলতে পারি না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফের বলার প্রতিবন্ধকতাসমূহ রয়ে যায়। যদিও এই জীবনে এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিচার হলো যে, সে মুসলমান, তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানেন যে, এই ব্যক্তি একটা মুনাফিক। আবারও, ইহা তাদেরকে কুফরগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কোন বাধা দেয় না, যেহেতু প্রণীত আইনসমূহ/সংবিধান হলো কুফর।

আমাদেরকে নিয়মানুবর্তী হতে হবে এবং পিরামিড তাকফীর করা যাবে না।(১৯) কাফের এবং মুসলমানদের মাঝে নিশ্চিত পার্থক্য সূচক দাগ টানা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক, যদিও মুসলমানদের মাঝে মুনাফিক, অজ্ঞ এবং বোকা মানুষেরাও থাকতে পারে। একজন মুসলমান, যে তাকফীরের উপযুক্ত নয় এবং যার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দলিল নেই, তাকে কাফের বলার থেকে একটা কাফেরকে তার নিফাক ও সন্দেহ সত্ত্বেও মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা একজনের ইসলামের জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ।(২০) এর মানে অপর দিকে এই নয় যে, আমরা জুলুম ও হারাম অপসারণ করার ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্যের অবহেলা করবো, যেহেতু ফিত্না সম্পর্কিত পূর্বোক্ত আয়াতটিই জুলুম অপসারণ করার জন্য যথেষ্ট নির্দেশনা দেয়।

উপসংহারে বলা যায় যে এরূপ অনেক দলিল রয়েছে যে, ইখলাসওয়ালা অশুদ্ধ কর্মপদ্ধতি ব্যবহারকারী মুসলমানদেরকে সন্দেহের ওজরের সুযোগ দেয়া উচিত। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। যারা এই বিষয়টি নিয়ে প্রত্যেককে কাফের বলে ঘোষণা করছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন তাদেরকে হিদায়াত করেন, যেন তারা ব্যাপারগুলোতে আরও পরিপক্বতার সাথে মনযোগ দিতে পারে।

যে ব্যক্তি ভোটদান কাজের সাথে জড়িত

দ্বিতীয় ভাগে যাদের কথা উল্লেখ করতে হয় তারা হলো, যারা ভোট দেয়। এই বিষয়টি আমাদের সময়কার মুসলমানদের মধ্যে প্রচুর বিতর্ক/বিরোধ-এর সৃষ্টি করেছে এবং ভোট দেয় এমন সকলকে তাকফীর করতে তাকফীরী মানসিকতার মানুষদেরকে উৎসাহ দিয়েছে। তাকফীর করার প্রতিবন্ধক ও পূর্বশর্তসমূহ সম্পর্কে ভুল ধারণা এবং সেই সাথে মুরতাদ বা যে ইসলাম গ্রহনের পর এতে অবিশ্বাস করে তার উপর বিচার সম্পর্কিত ভুল ধারণার কারণে ইহা ঘটেছে। যে তাকফীরের মূলনীতিসমূহ প্রয়োগ করতে চায়, তার সর্বপ্রথমে সেসকল বিষয়াদি জানতে হবে, যা একজনকে ঈমান আনার পরে কাফের এ পরিণত করে। শুধুমাত্র এরপরেই দ্বীনের সঠিক ধারণা অর্জন করা সম্ভব হবে। এর পূর্ব পর্যন্ত, সেই ব্যক্তি শ্রেফ কারণ বা যথেষ্ট দলিল না থাকা সত্ত্বেও তাকফীর করবে।

যারা ভোটদান কাজটির সাথে জড়িত, তারা প্রধানত ৩টি শ্রেণীতে পড়ে,

১। যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে এবং তারা ভোট দেয় এবং তারা নিজেরা নির্বাচিত হলে খুশীই হতো এবং সুযোগ থাকলে আইন প্রণয়নও করতো। এসকল লোকেরা মুরতাদ। কিন্তু, আমরা শুধুমাত্র তখনই এদের সম্পর্কে জানতে পারি, যখন তারা তাদের বিশ্বাসের কথা মুখে বলে।

২। যারা এই কারণে ভোট দেয় যে, তাদেরকে ঘুষ দেয়া হয়েছে অথবা কিছু দুনিয়া অর্জনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে বা এরূপ কিছু। এই লোকেরা যেহেতু তাদের অবস্থান উন্নয়নের জন্য এরূপ করছে তাই তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত হুকুম হয় ফাসেক (বিদ্রোহী, গুনাহগার), যারা শুধুমাত্র শোচনীয় মূল্যে নিজেদের দ্বীনকেই বিক্রয় করছে না, বরং নিজেদেরকেও বিক্রয় করে দিচ্ছে।

---

(১৯)পিরামিড তাকফীর হলো একটি কাজের সাথে জড়িত সকল মানুষের উপরে তাকফীর করা। এতে যা হয় তা হলো, সকলকে কাফের আখ্যা দেওয়া হয়, যদিও সকলেই এরূপ আখ্যার প্রাপ্য নয়। এরূপ তাকফীরের একটি মডেল হলো এরূপ: প্রথমে সকলের উপরে যারা আছে তারা হলো শাসকেরা, মাঝে আলেম ও আর্মিদের অবস্থান এবং সকলের নীচে রয়েছে সাধারণ জনগণ। যখন নির্বিশেষে আর্মিদের সকলকে তাকফীর করা হয় এবং কর্তৃত্বে থাকা লোকদের থেকে সবাইকে তাকফীর করা হয়, এরপর যদি তাদের নীচের সকল সাধারণ জনগণকে তাকফীর করা হয়, যেহেতু তাদেরকে কোন অপকর্ম করতে দেখা যায় কিংবা এই পিরামিডের অন্যান্য অংশকে সাহায্য করতে দেখা যায়। ভোটিং-এর ব্যাপারে এই বইটির যে অংশে আলোচনা করা হয়েছে এই ব্যাপারটি সেখানে আরও স্বচ্ছ হবে।

(২০)এর উদাহরণ পাওয়া যায় যখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুনাফিকদেরকে তাদের নাম ধরে জানতেন, কিন্তু এরপরেও তাদেরকে তাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দেওয়ার আদেশ দেন নি, যদিও তাদের নিফাক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং কিছু সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর নিকট প্রকাশ্য ছিল। এর কারণ হলো তখন তারা সমাজে মুসলমান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কাফের ডাকার প্রতিবন্ধকতাসমূহ তাদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিল।

৩। এছাড়াও এমন মুসলমানগণ রয়েছেন, যারা প্রতারিত হয়েছেন শয়তান আলেম, জাহেল (চূড়ান্ত পর্যায়ের অজ্ঞ) এবং অজ্ঞ লোক দ্বারা অথবা শয়তানের মুখপাত্রদের দ্বারা, যারা অকল্যাণকে কল্যাণকর রূপে উপস্থাপন করে। এসকল লোকদের মাঝে **৩**টি গোষ্ঠী রয়েছে,

ক. যারা তাদের আলেমদের অন্ধঅনুসরণ করেন। তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার থেকে নির্ধারিত হারামটি জানেন এবং আমরা তা পূর্বে উল্লেখ করেছি “**এমন লোকদের সাথে বসে না, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে উপহাস করছে।**” এই লোকেরা মুশরিক, কারণ তারা তাদের আলেমদের অন্ধঅনুসরণের মাধ্যমে আনুগত্যের ক্ষেত্রে শির্‌ক করেছে এবং আল কোরআনের উপরে তাদের আলেমদের কথাকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং তারা লোকদেরকে শরীয়ত উপেক্ষা করে আইন প্রণয়ন করতে দিয়েছে এবং শির্‌কে সহায়তা করছে।

খ. এরা হলো সেসকল মানুষ, যারা তাদের আলেমদের এই হুমকির শিকার যে, যদি তারা ভোট প্রদান না করেন, তবে এর মানে দাঁড়ায় যে, তারা কথা ও কাজের মাধ্যমে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করছেন না। তাদেরকে প্রতারিত করা হয়েছে এবং তাদের কথা ও কাজকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দ্বীনের সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করা হয় না। তাদেরকে হুমকি দেয়া হয়েছে যে, যদি তারা ভোট না দেন এবং পার্লামেন্টে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সৎ লোকদেরকে নির্বাচন না করেন, তবে শরীয়তের অবস্থা যা আছে তা আরও করুণ হয়ে পড়বে। এই ধরনের লোকেরা ভুল পথে আছে, তবে তারা নিশ্চিতভাবে কাফের অথবা মুনাফিক নয়, যেহেতু তাদেরকে ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন তাদেরকে ক্ষমা করেন, যেহেতু তাদের হিদায়াতের জন্য দাওয়াত, শিক্ষা এবং দোয়া প্রয়োজন।

গ. এরা হলো সেসকল মানুষ, যাদেরকে ভোটদানে বাধ্য করা হয়েছে, যেমনটা দেখা যায় কিছু অত্যাচারী শাসনব্যবস্থায়, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে, যেখানে সরকার নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, যদি সে ভোটপ্রদান না করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি কোন প্রকারের মেডিকেল বা অন্যান্য সাহায্য পাবে না, যদি সে তার ভোটার আইডি কার্ড না বানায়। অনেকে হয়তো দেশের বাহিরে যাবার জন্য তাদের ব্যবসা বা ভ্রমনের ছাড়পত্র থেকে বঞ্চিত হবে। এই ধরনের লোকদের বাধ্য করা হচ্ছে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের নিয়্যত অনুসারে তাদের বিচার করবেন, তাদের উপর কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং সেটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল কি না ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে।

কিন্তু এসকল লোকদের বিচার করা আর তাদের এসব বিষয় এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা ছিল কি না তা যাচাই করা আমাদের পক্ষে ন্যায়ানুগ ও সঠিক হবে না। যাহোক, উপরে উল্লিখিত এসব কিছুর জন্য সকল ভোটারদেরকে কাফের বলা একটি অযথার্থ কাজ, যা তাকফীরী অথবা খারেজীরা করে থাকে, তারা শরীয়তের অনুপস্থিতিতে মানুষের অবস্থার বাস্তবতা এবং যারা অত্যাচারিত তাদের আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা আছে কি না তা না বুঝেই এধরনের কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে কেউ যদি একটি নির্দিষ্ট ধরনের লোকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে চায় তাহলে প্রত্যেকটি বিষয়কে পৃথক পৃথক ভাবে গভীর পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। এর মানে মুজাহিদীনদের সংগ্রাম বিলম্ব করা বা ধীরগতির করে দেয়া নয়, কারণ কতক মানুষকে বল প্রয়োগ করা হয়েছে, আর কতক পথভ্রষ্ট। তবে এই কারণে আল্লাহর পথের যোদ্ধাদেরকে ভোট প্রদানের স্থান সমূহে আক্রমণ করা অথবা গণতন্ত্র নামে পরিচিত নতুন বেদাতের মিলনকেন্দ্রসমূহকে এবং যারা এর প্রচার করে তাদেরকে ধ্বংস করার ব্যাপারে বিলম্বিত করা উচিত নয়। তবে কারণ ব্যতীত কোন ধরনের লোকদেরকে টার্গেট করা মুজাহিদ ভাইদের কাজ নয়। আর যদি মুজাহিদীনদের কোন ধরনের ভুল হয়ে থাকে, তবে তাদেরকে অনিশ্চয়তার ওজরের সুযোগ দেয়া উচিত এবং যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রাস্তায় যুদ্ধ করে, তাদের বিরুদ্ধে বাতিল আইন প্রণেতাদের অপপ্রচার গ্রহন করা আমাদের জন্য উচিত হবে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

“ফিত্‌নার সময়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো সে, যে তার ঘোড়ায় চড়ছে, আল্লাহর শত্রুদেরকে সে আতংকিত করছে এবং তারা তাকে আতংকিত করছে। এরপর দ্বিতীয় সর্বোত্তম হলো সেই ব্যক্তি, যে পর্বতে বাস করে, আল্লাহর ইবাদত করছে, যাকাত দিচ্ছে এবং মৃত্যুর অপেক্ষা করছে।” – সহীহ মুসলিম

এখানে তৃতীয় কোন ভাগ নেই, অতএব, যারা কষ্ট ভোগ করছে, যদি তারা যুদ্ধ করতে না পারে, তবে তাদের হিজরত করা উচিত। আমাদের বুঝা উচিত যে, যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রাস্তায় যুদ্ধ করছে, তারাই সবচাইতে সৌভাগ্যবান ও সার্থক, এবং যারা হিজরত করেছে এবং ফিত্‌না, শির্‌ক ও জুলুমের জায়গা ত্যাগ করেছে, তারা মুক্তিপ্রাপ্ত। যারা এই দু'টির কোনটিই করতে পারেনি, তারা তাদের নিয়্যত ও আমল অনুসারে পুনরুত্থিত হবে, তবে তাদের কোন ক্রমেই পৃথিবীতে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘটিত মূল যুদ্ধের মাঝে আসা, ইহাকে মন্থর করার চেষ্টা করা অথবা ইহাকে বাতিল করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

=====***=====

কুফরী কাজ এবং যে ব্যক্তি কাজটি করছে - তাদের মাঝে পার্থক্য

ইহা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ থেকে বহুল প্রচলিত যে, কৃত আমল এবং আমলকারী ব্যক্তিটির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর ব্যবহৃত অনেক উক্তি অর্বাচীনরা অপ্রাসঙ্গিকভাবে ব্যবহার করেছে। এর একটি উদাহরণ হলো শাইখ উল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এর ফতোয়ায় ব্যবহৃত নিম্নোক্ত শক্ত কথাগুলো:

"যখনই কোন আলেম শাসকের হুকুম (আইন/বিধান) এর অনুসরণ করে, এবং নিজের জ্ঞান পরিত্যাগ করে, যা আল কোরআন ও সুন্নাতের বিরোধী, সে কাফের (অবিশ্বাসী) এবং মুরতাদ (দ্বীনত্যাগকারী) যার এই দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি প্রাপ্য। এই হুকুমটি সেসকল আলেমদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা ভয়ে বা সুবিধা গ্রহনের উদ্দেশ্যে মংগলদের দিকে ঝাঁপ দিয়েছে এবং তাদের সাথে যোগদান করেছে। এই আলেমরা কৈফিয়ত দেখিয়েছে যে, কিছু মংগলরা শাহাদাহ্ [সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ এক এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রাসূল] উচ্চারণ করছে এবং তারা মুসলমান ছিল।"(২১),(২২)

এই ফতোয়াটি অনেকের দ্বারাই ভুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে একথা বুঝানোর জন্য যে, যদি তাদের সাথে কারো কোন ব্যাপারে দ্বিমত থাকে অথবা কাউকে তাকফীর করার ক্ষেত্রে যদি কেউ তাদের সাথে একমত না হয়, তবে কোন প্রকারের সন্দেহ ছাড়াই সেক্ষেত্রে সেই ভিন্নমতপোষণকারী ব্যক্তির উপর নিখাঁদ তাকফীর প্রযোজ্য হয়ে পড়বে। যারা এই ফতোয়াটির অপব্যবহার করে, তাদের বিশ্বাস হলো, যদি কেউ কারো এই ফতোয়ার ব্যাখ্যার উপরে ভিত্তি করে কাউকে তাকফীর করার সাথে একমত না হয়, তবে ভিন্নমতপোষণকারী ব্যক্তিও কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু ইহা একটি খুবই স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন যুক্তি। আমরা যখন অপ্রাসঙ্গিকভাবে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এর কয়েকটা উক্তি বা নিছক এক খন্ড অনুচ্ছেদ দেখতে পাই, তখন ইহা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, ইহা তাঁর প্রতি ন্যায় আচরণের পরিপন্থি একটা কাজ।

কারণ ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এই ফতোয়াটির দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছিলেন, তা জানার সবচাইতে উত্তম পন্থা হলো এই বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এর সাথেই পরামর্শ করা। আসুন আমরা ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এর আরও কয়েকটি উক্তি দেখি,

"আমি এই বিষয়ের পক্ষে অনেক দলিল দিয়েছি যে, কিছু আমল আছে যেগুলো হলো কুফর। আর বিভিন্ন সময় কিছু গোষ্ঠী এমন আমল করে যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেন নি। কিন্তু একজন ব্যক্তিবিশেষের সেই আমলটি করার জন্য তাকে কাফের বলে সম্বোধন করা অথবা সেজন্য তাকে চিরন্তন আগুনের অধিবাসী হিসেবে সাব্যস্ত করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ কথা বলার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ দলিল পাওয়া যায়। আর এর মাঝে যা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত তা হলো, তাকফীর করার শর্তাবলীর বিবেচনা করা এবং তাকফীর করার ক্ষেত্রে যেসকল প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান থাকলে তাকফীর করা যায় না সেগুলো অনুপস্থিত হওয়া। আর আমরা কুফর, ফিস্‌ক এবং অন্যান্য স্তরের পাপের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উক্তিসমূহকে সর্বজনীন হিসেবে গ্রহন করি। তবে এর মানে এই নয় যে, সেই ব্যক্তিবিশেষও সেই উক্তিটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। আমরা কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর কোন ধরনের বিচারের ফলাফল সাব্যস্ত করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অবস্থা/পরিস্থিতির জন্য তার উপর সেই ধরনের

---

(২১)ইহা যেন তিনি আমাদের আজকের বর্তমান পরিস্থিতির কথাই বর্ণনা করছেন।

(২২)মাজমু' আল ফাতাওয়া, ভলিউম: ৩৫, পৃষ্ঠা: ৩৭৩

বিচার করার শর্তাবলী পূরণ হয়ে যায়। আর সেই সাথে আমরা কোন ব্যক্তির একটি আমলের পিছনে যেই কারণ বিদ্যমান থাকে সেটার ভিত্তিতে বিচার করি। আমি আগেও এই হুকুমটি ব্যাখ্যা করেছি।”(২৩)

তিনি এই হুকুমটি তার জীবদ্দশায় ব্যবহার করেছিলেন যখন অনেক আলেম (মুসলমান বিবেচনা করে) মংগলদের পক্ষে গিয়েছিলেন যেহেতু তখন মংগলরা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’ সাক্ষ্য দিত। তখন অনেক আলেম ছিলেন যারা মংগলদেরকে এভাবে সমর্থন করেছিলেন। আর তাই যারা ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এর ফতোয়ার অপব্যবহার করছে তাদেরকে আমরা বলি যে, তারা যেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এর একটি উক্তি পেশ করে যেখানে তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) যেসকল আলেম মংগলদের দিকে গমন করেছিলেন তাদের থেকে একজন আলেম কে নির্দিষ্ট করে তাকফীর করেছেন।

আসলে এই ধরনের উক্তি যখন চাওয়া হয়েছিল তখন তারা তা পেশ করতে পারেনি। আর কোন আলেম বা তার ছাত্রদেরকে কাফের বলে সম্বোধন করার চেয়ে যারা কাফেরদের পক্ষালম্বন করেছিলেন অথবা যারা ঐসকল ছাত্রদেরকে কাফের মনে করেননি, তাদেরকে কাফের সম্বোধন করার ব্যাপারে উক্তি পেশ করা তো আরও কঠিন। **দয়া করে আমাদেরকে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এর একটি উক্তি পেশ করুন যেখানে তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) ঐ সকল আলেম এবং তাদের ছাত্রগণ এবং ঐ ব্যক্তিদেরকে কাফের বলেছেন, যারা তাদেরকে (মংগলদেরকে) কাফের বিবেচনা করার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন।**

সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) সময় যে সকল মানুষেরা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, তাদের প্রত্যেককেই সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) কাফের ঘোষণা করেন নি, তবে ওনারা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যাকাত দিতে অস্বীকারকারী মানুষদেরকে সাধারণভাবে একটি কাফের গোষ্ঠী বিবেচনা করেছিলেন। আর ওনারা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যখন যাকাত দিতে অস্বীকারকারী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তখন কাফেরদের বিরুদ্ধে ওনারা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যেরূপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন যাকাত দানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে একইরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অর্থাৎ, তখন সেই গোষ্ঠীটিকে একদল কাফের বিবেচনা করেই যুদ্ধ করেছিলেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর ফতোয়ায় আরও উল্লেখ করেছেন,

“এর মানে হলো সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং তাঁদের পরবর্তী ইমামগণ (রাহিমাহুল্লাহ) সর্বসম্মতভাবে যা গ্রহন করেছেন তা হলো, যে সকল মানুষেরা যাকাত প্রদান করা বন্ধ করে দেয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে এমনকি যদিও তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে এবং রমযান মাসে সিয়াম পালন করে। সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) সময়কার সেসকল মানুষদের তাদের এরূপ আমলের জন্য কোন গ্রহনযোগ্য ব্যাখ্যা ছিল না। এ কারণেই তাদেরকে মুরতাদ বলা হয়েছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছিল, কারণ তারা যাকাত দেয়া বন্ধ করে দিয়েছিল যদিও তারা স্বীকার করছিল যে আল্লাহর হুকুম অনুসারে তাদের যাকাত দেয়া উচিত।”(২৪)

যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট কিন্তু মুসলমানদের মাঝেই বসবাস করে আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের থেকে নিজেকে বাস্তবে পৃথক করে নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে চলে তাদের মাঝে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ পার্থক্য করে।

সাধারণ/সর্বজনীন তাকফীর বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য আমরা আবারও শাইখ উল-ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এর উক্তিসমূহে ফিরে যাবো,

---

(২৩)প্রাগুক্ত, ভলিউম: ২৮, পৃষ্ঠা: ৫০০-৫০১

(২৪)মাজমু'ফাতাওয়া, ভলিউমঃ২৮, পৃষ্ঠাঃ৫১৮

“কোন ব্যক্তিবিশেষকে কাফের বা ফাসেক বা জালেম না বলার ব্যাপারে আমি সবচেয়ে কঠোর যতক্ষণ না সেই ব্যক্তির উপর সুস্পষ্টভাবে হুজ্জত (প্রমাণ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর যে এর বিরোধীতা করবে সে কাফের বা ফাসেক বা জালেম এ পরিণত হবে, আর এই হুকুমটি সর্বজনীন হিসেবে কার্যকর হবে যখন এভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হবে এবং কার্যকরভাবে তা জানিয়ে দেয়া হবে।

আর সলফে সালেহীনগণ এসকল বিষয়ে অনেক সময়েই একে অপরের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, কিন্তু এতে তাঁদের কেউই কখনোই অপরকে কুফর, ফিস্‌ক অথবা অবাধ্যতা ইত্যাদি পাপের দোষে দোষী সাব্যস্ত করেন নি। আর আমি ইহা স্পষ্ট করে বলেছি যে, সলফে সালেহীনগণ এবং ইমামগণ এক্ষেত্রে যা করেছেন তা হলো তাকফীরের উক্তিসমূহকে সাধারণ/সর্বজনীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা, যেমন: ‘যে কেউই অমুক আর তমুক বলে/করে, তবে তার জন্য ইহাই হলো সত্য।’ তবে যেটা বাধ্যতামূলক তা হলো, সাধারণ/সর্বজনীন বিষয় এবং যাকে নির্দিষ্ট করে কোন কিছুর উপর ভিত্তি করে নামকরণ করা হয়, তাদের মাঝে পার্থক্য করা। আর ইসলামের বড় বিষয়সমূহের মাঝে ইহাই হলো প্রথম বিষয় যার ব্যাপারে উম্মাতের মাঝে ভিন্নমত হয়েছে। আর বিষয়টি হলো (আল্লাহর শাস্তির) হুমকি।

কারণ নিশ্চয়ই কোরআনে আল্লাহর (শাস্তি সম্পর্কিত) হুমকিসমূহর প্রকৃতির স্বরূপ হলো সাধারণ/সর্বজনীন। যেমন আল্লাহর উক্তি,

إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما

‘যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করে,...’ (২৫)

আর একইভাবে রয়েছে যে, ‘যে কেউ তমুক কাজ করে, তবে সে হলো অমুক...।’ আর নিশ্চয়ই ইহার স্বরূপই হলো সাধারণ/সর্বজনীন, আর সলফে সালেহীনগণ এরূপ সাধারণ/সর্বজনীন উক্তির ব্যবহার করেছেন, ‘যে কেউ অমুক কথা বলে, তবে সে হলো অমুক...।’ এভাবে এরূপ উক্তি সেই প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিবিশেষকে তার কথা বা আমলের জন্য তাকে বিচার ও শাস্তির হুমকির ভয়ে ভীত করে তুলে এবং তাকে তাওবা ও ভাল আমলের দিকে ধাবিত করে যা পূর্ববর্তী গুনাহকে মুছে দেয় বা যেই দোয়া গ্রহনযোগ্য হয় তার দিকে উৎসাহিত করে।

আর তাকফীরটি হলো হুমকির অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং সত্যিই যদি কেউ এরূপ কোন (কুফর) উক্তি করে থাকে যার ফলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেছেন তা অস্বীকার করা হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি উক্তিটি করেছে সে তখন মুসলমান অবস্থায় থেকে থাকে অথবা সে অনেক দূরবর্তী কোন মরুভূমিতে ছিল বা এরকম কিছু হয়ে থাকে, তবে সে যা অস্বীকার করেছে তার জন্য তার কুফর করা হয়নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার উপর হুজ্জত (প্রমাণ) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর যদি সেই ব্যক্তি তার ব্যাপারে দলিলসমূহ না শুনে থাকে, অথবা এমন হয় যে সে শুনেছে কিন্তু তার দৃষ্টিতে সেগুলো তার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি, অথবা সে সেগুলোর থেকে ফিরে যায়, আর সে এভাবে সেসকল দলিলসমূহের ব্যাখ্যা অনুসারে তার উপর যা বাধ্যতামূলক তা থেকে দূরে সরে যায়, এভাবে সে যদি গুনাহগার হয়ে থাকে, তবে আমি এই ব্যাপারে সেই হাদীসটি বলেছি যা দুইটি সহীহ্ হাদীসের গ্রন্থে রয়েছে, যেখানে এক ব্যক্তি বলেছে,

‘যখন আমি মৃত্যুবরণ করবো, তখন আমাকে তোমরা পুড়িয়ে ফেলো, এরপরে আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে গুঁড়ায় পরিণত করে ফেলো, এরপরে সেই ভস্ম-গুঁড়াকে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিয়ো। কারণ যদি আল্লাহর ক্ষমতা থাকে তবে তিনি আমাকে এমন এক শাস্তির দ্বারা শাস্তি দিবেন যেরূপ শাস্তি মানবজাতির কাউকে পূর্বে কখনো দেয়া হয়নি।’

---

(২৫)সূরাহ্ আন নিসা, আয়াত: ১০

ফলে মানুষেরা সেই ব্যক্তির কথানুসারে সেরূপই করলো, পরে আল্লাহ তাকে বললেন, 'তুমি কি কারণে এমন করলে?' সে বললো, 'আপনার ভয়ে!' ফলে তিনি (আল্লাহ) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আর এই লোকটি আল্লাহর (পুনরুত্থান করার) ক্ষমতার ব্যাপারে এবং নিজের ভস্ম-গুঁড়া অবস্থা থেকে আবার ফিরে আসার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছিল। ইহা খুবই বিরোধী একটা চিন্তা, লোকটির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সে (মৃত অবস্থা থেকে) কখনোই ফিরে আসবে না, আর মুসলমানদের ঐকমত্য অনুসারে ইহা হলো কুফর।

কিন্তু লোকটি ছিল জাহেল (চরম অজ্ঞ) এবং সে তা জানতো না। আর লোকটি ছিল ঈমানদার, সে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করছিল। ফলে তিনি (আল্লাহ) তাকে (লোকটিকে) এ কারণে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। আর এই ব্যাখ্যাটি এসেছে সেসকল ব্যক্তিদের থেকে যারা ইজতিহাদ করেন এবং যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনুসরণ করতে চান। সুতরাং এই উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, ক্ষমাশীলতাই অধিক প্রাধান্য পায়।"(২৬)

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (রাহিমাহুল্লাহ) অন্যান্য আরও উক্তিসমূহ থেকেও আমরা দেখতে পাই যে, তাকফীর করার প্রতিবন্ধকতাসমূহের কথা বিবেচনা না করেই একজন ব্যক্তিকে তাকফীর করার উদ্দেশ্যে তাঁর (রাহিমাহুল্লাহ) উক্তিসমূহের অপব্যবহার করা হয়েছে। তাকফীর করার প্রতিবন্ধকতাসমূহ হলঃ

ক. তাওয়ীল (ভুল ব্যাখ্যা)

খ. জুহ্ল (চরম অজ্ঞতা)

আর ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) সহ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর সকলেই এই দু'টি প্রতিবন্ধকতা যাচাই করে নিতেন। কিন্তু এখন যাদের ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে তারা এই দু'টি প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারে বিবেচনা না করেই তাদের নিছক সন্দেহের উপরে ভিত্তি করে তাকফীর করে বসে। আর তাকফীরী মানসিকতার মানুষেরা যে সকল ভয়াবহ ব্যাধির অধিকারী তার মাঝে ইহাই সবচাইতে ভয়াবহ।

আর দুঃখজনকভাবে এই তাকফীরী মতবাদকে সমর্থন করার জন্য উপরে উল্লিখিত ইমামসহ আরও অনেক মহান ইমামের নামের উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এগুলো অপবাদেরই স্বরূপ। এই প্রসঙ্গে আরেকজন ইমাম হলেন শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লাহ), যার নাম খারেজী ও তাকফীরী মানসিকতার মানুষদের দ্বারা এরূপে উচ্চারিত হয় যেন তিনি তাদেরই শাইখ। কিন্তু আসলে বিষয়টা যে ঠিক তার বিপরীত, তা কিছুক্ষণের মাঝেই স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।

শাইখ উল-ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে 'আব্দুল ওয়াহ্হাব (রাহিমাহুল্লাহ) তাকফীরের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে বলেছেন,

"আর আমার শত্রুরা আমার সম্পর্কে বলেছে যে, আমি সন্দেহ ও অন্যায্য অভিযোগের উপরে ভিত্তি করে মানুষকে কাফের বলে ঘোষণা দেই অথবা আমি সেই ব্যক্তিকেও কাফের বলে ঘোষণা দেই যে ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত দলিলসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ। ইহা একটা বিশাল মিথ্যা কথা যা মানুষকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।"(২৭)

---

(২৬)মাজমু' আল ফাতাওয়া, ভলিউম: ০৩, পৃষ্ঠা: ২১৯-২৩১

(২৭)মাজমু'আমু'আল্লাফাত, পৃষ্ঠাঃ৫৮

এভাবে শাইখ উল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাবের (রাহিমাহুল্লাহ) এই ফতোয়া থেকে আমরা জানতে পারি যে, একজন উপযুক্ত মুসলমান হবার জন্য আপনার কাউকে কাফের বলে ডাকার প্রয়োজন নেই। এই ইমাম তাঁর সময়ে যে সকল মানুষ কবরস্থানে গমন করতো তাদের প্রত্যেককেই কাফের বলে ঘোষণা দেন নি, কারণ তিনি জানতেন যে তাদের মাঝে এমন মানুষও আছে যারা একটা তাওয়ীল (ব্যাখ্যা) দ্বারা এই কাজে পরিচালিত হচ্ছে, আর এভাবে তারা তাকফীর থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়েছিল।

একজন 'ভালো মুসলমান' হবার জন্য তাকফীর করার বিষয়টা ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সাধারণ মুসলমানদের সাথে কথা বলেছেন তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে এরূপ বলেন নি যে, আল্লাহর ন্যায়পরায়ণ বান্দা হবার জন্য তাদেরকে তাকফীর করতে হবে। এর একটি উদাহরণ হলো নিম্নোক্ত হাদীসটিঃ

أنالأعرابيلماسألالنبيصلاللّٰهعليهوسلممافرضاللّٰهعليفياليوموالليلة؟قالخمسصلوات. قالهلعليغيرهن؟قاللاإلاأنتتطوع.
فقالالأعرابيوالذيبعثبالحق! لاأزيدعليهنولاأنقصمنهن. فقالأفلحالرجلإنصدق.

"মরুভূমির এক আরব এসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ আমার জন্য রাতে ও দিনে কি কি বিষয় বাধ্যতামূলক/ফরজ করেছেন?' তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ।' তিনি (আরব লোকটি) বললেন, 'এগুলোর পরে আর কোন কিছু কি আছে?' তিনি বললেন, 'না, এরপরে শুধু আছে সেসকল বিষয় যা তুমি স্বেচ্ছায় করো।' আরব ব্যক্তিটি এরপরে বললেন, 'সেই সত্ত্বার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন! আমি সেগুলোর (পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ) মাঝে বৃদ্ধিও ঘটাবো না, সেগুলোর (পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ) থেকে কোন কিছু হ্রাসও করবো না।' তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'এই ব্যক্তিটি সফল হবে যদি সে তার কথার ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাকে।'"(২৮)

হাদীসের কোন অংশেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাধারণ মুসলমানের জন্য তাকফীর করাকে বাধ্যতামূলক আমল হিসেবে উল্লেখ করেন নি। আরব বেদুইনটি ছিলেন একজন সাধারণ মুসলমান যিনি দ্বীনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বাধ্যতামূলক আমলসমূহের ব্যাপারে জানতে এসেছিলেন। আর তাকে সেই উত্তরই দেয়া হয়েছিল যা একজন সাধারণ মুসলমান হিসেবে তার জানা প্রয়োজন।

একজন মুসলমানকে যে একজন ভালো মুসলমান হবার জন্য তাকফীর করার প্রয়োজন নেই এই পয়েন্টটিকে আরও জোরদার করার জন্য আল্লাহর উক্তিও উল্লেখ করছি,

ومن يكْفربالطاغوت ويؤمن باللّٰه فقد استمسك بالعروة الوثقى

"অতএব যে ব্যক্তি তাগুতের উপর অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে সে দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরলো..."(২৯)

আমাদের আরবী আয়াতটিতে লক্ষ্য করা উচিত যে, "**وَمَنْيَّكْفُرْبِالطَّاغُوْتِ**" (যে ব্যক্তি তাগুতের উপর অবিশ্বাস করে) বলা হয়েছে, "**وَمَنْيُّكَفِّرْبِالطَّاغُوْتِ**" (যে ব্যক্তি তাগুতকে কাফের বলে সম্বোধন করে) বলা হয় নি।

---

(২৮)ইমাম আল বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে বলেছেন, আর রয়েছে আল মুগনি, ভলিউম: ০১-এ, সহীহ হিসেবে শ্রেণীভুক্ত
(২৯)সূরাহ্ আল বাকারাহ: আয়াত: ২৫৬

এর থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাধারণ মুসলমানদেরকে তাগুতের উপরে তাকফীর করতে আদেশ দেন নি। আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ করেছেন যেন আমরা তাগুতকে অবিশ্বাস করি এবং এর আনুগত্য না করি। আমরা যদি তাগুতের অনুসরণ করি তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে, আমরা কেন তাগুতকে অবিশ্বাস করিনি। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একথা জিজ্ঞেস করবেন না যে, **‘তুমি কেন তাগুতকে কাফের বলে সম্বোধন করোনি? তুমি কেন তাগুতের উপরে তাকফীর করোনি?!’**

এরকম হুকুম কোরআনের কোন আয়াতেই পাওয়া যায়না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাধারণ মুসলমানদেরকে কখনোই কাউকে তাকফীর আল মুয়াইয়িন বা তাকফীর আল ইজতিহাদ করার আদেশ করেন নি। এর কারণ হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিচার দিবসে আপনাকে একথা জিজ্ঞেস করবেন না যে আপনি তাকে কেন কাফের বলে সম্বোধন করেন নি। কিন্তু আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞেস করবেন (যদি আপনি কোন ব্যক্তিকে আপনার সন্দেহের ভিত্তিতে কাফের বলে সম্বোধন করে থাকেন) যে আপনি সেই ব্যক্তিকে কেন কাফের বলে সম্বোধন করেছিলেন?

তাকফীরের বিষয়টিতে এই ধরনের প্রবণতা দেখা যায় যখন তাকফীর করার উপযুক্ত পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ তাকফীর করতে অগ্রসর হয়, অথচ এই বিষয়টি শুধুমাত্র উপযুক্ত ইল্‌ম/জ্ঞানের অধিকারী আলেমদেরই করতে হয়। তাই আলোচনা আরও অগ্রসর করার পূর্বে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেগুলো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা জরুরি। আমরা আমাদের ভাই ও বোনদের সামনে সে সকল উপযুক্ত পদ্ধতিসমূহ তুলে ধরবো যে পদ্ধতিসমূহ ইল্‌ম/জ্ঞানের অধিকারী মানুষেরা তাকফীর বিষয়টির ক্ষেত্রে অবলম্বন করেন।

=====***=====

তাকফীর বিষয়টির ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদ্ধতি

ক. কোন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে কুফর সাব্যস্ত করা বা তার উপরে কুফরের অভিযোগ তুলে তার উপর তাকফীর করার সাথে দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদির কোন সম্পর্ক নেই।

এভাবে এই নীতি অনুসারে, যখন ইল্‌মের অধিকারী দুইজন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের কুফরের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন, তখন এর ফলাফলস্বরূপ তাদের থেকে কোন একজন অপরজনের বিরুদ্ধে কুফরের অভিযোগ তুলে তার উপর তাকফীর করবেন না, অথবা একে অপরের উপর তাকফীর করবেন না। এর কারণ হলো তাকফীর আল মুয়াইয়িন বা তাকফীর আল ইজতিহাদ দুইজনের কারোই দ্বীনের কোন মৌলিক বিষয়ের সাথে জড়িত নয়।

শাইখ উল-ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) আমাদেরকে একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন যখন তিনি এই হুকুমটির কথা বলেছেন,

"আর সলফে সালেহীনগণ এসকল বিষয়ে অনেক সময়েই একে অপরের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, কিন্তু এতে তাদের কেউই কখনোই অপরকে কুফর, ফিস্‌ক অথবা অবাধ্যতা ইত্যাদি পাপের দোষে দোষী সাব্যস্ত করেন নি।"(৩০)

খ. মুসলমানদের মাঝে বসবাসকারী একজন ঈমানদার ব্যক্তিকে ভুলক্রমে কাফের হিসেবে নির্ধারন করার চাইতে মুসলমানদের মাঝে বসবাসকারী একজন মুনাফিককে ভুলক্রমে কাফের না বলে ছেড়ে দেয়াই অধিকতর নিরাপদ।

আর এই কারণেই যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলমানদের মাঝে বসবাসকারী কিছু মুনাফিকের ব্যাপারে জানতেন, তখন তিনি তাদেরকে তাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দেন নি, বা তাদের সম্পদ থেকে পৃথক হবার ব্যাপারেও নির্দেশ দেন নি। এই হুকুমটি সংরক্ষণের জন্যই তিনি এমনটি করেছিলেন।

আর যদি কোন সংশয়ের উপস্থিতি থেকে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে তাকফীর করার দিকে অগ্রসর হওয়ার চাইতে সেটা ছেড়ে দেয়াই অধিকতর শ্রেয়। কারণ যদি তাকফীরকারী ব্যক্তিটি সঠিক হয়ে থাকে তবে সে আখিরাতে পুরস্কৃত হবে, কিন্তু যদি তাকফীরকারী ব্যক্তিটি ভুল হয়ে থাকে তাহলে তো সে একজন মুসলমানকেই কাফের বলে নির্ধারন করলো, আর এর জন্য সে আখিরাতে তার আমলের উপযুক্ত শাস্তি পেতে পারে, অথবা কুফরের যে অভিযোগ সে তুলেছিল তা তার দিকেই ফিরে আসতে পারে, আর পরবর্তীতে সে নিজেই কাফের হিসেবে বিচারকৃত হতে পারে, ঠিক যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"যখনই কোন ব্যক্তি তার ভাইকে বলে, 'হে কাফের', তবে তাদের যে কোন একজনই তা (একটা কাফের) হবে।"(৩১)

---

(৩০)মাজমু' আল ফাতাওয়া, ভলিউমঃ০৩, পৃষ্ঠাঃ২১৯-২৩১

(৩১)ইমাম আহ্‌মদ, আল বাযযার, আত্-তাবারানি, আল বাইহাকি-এর দ্বারা সংগ্রহকৃত এবং মাজমা'উয্-যাওয়া'ইদ এবং মুসনাদ আবু আওয়ানাহ্ (রাহিমাহুমুল্লাহ) এর দ্বারা উল্লেখকৃত।

কাফের সৈনিক অথবা বর্তমান মুসলমান দেশের সেনাবাহিনী থেকে সাহায্য নেয়ার ক্ষেত্রে হুকুম

যদি কোন ফাসেক মুসলমান ভাড়াটে কাফের সৈনিকদেরকে ব্যবহার করে তাহলে কি হবে? তার মতে (ইংল্যান্ডের শাইখ ফয়সাল যিনি তাকফীরের ক্ষেত্রে কিছুটা বাড়াবড়ি করেছেন) তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি কাফের হবে। কিন্তু ইহা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর চিন্তাধারা নয়।

ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) এর মতে ‘কেউ যদি নিয়মিত কাফের সৈনিকদের সাহায্য নেয়, তবে সেটা বিপদজনক।’ কখনো কখনো মানুষ ইহাকে ব্যাখ্যা হিসেবে নেয়। একারণে কেউ যদি ৯০% সময় কাফেরদের সাহায্য নেয়, আমরা তাদেরকে কাফের বলতে পারি না। তাই তাদেরকে কাফের বলা হয় না। তারা এই কথাকে এভাবে ব্যাখ্যা করে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন ‘কাফেরদেরকে ব্যবহার করা জায়েজ। যদি ফাসেকরা বায়াত ভংগ করে, বিদ্রোহের জন্য কাফেরদের সাহায্য নেয়, তবে ইহা হারাম (তিনি কুফর বলেননি)। সত্যপন্থীগণ এবং আলেমরা এই ধরনের কাজ কখনো মেনে নিবেন না।’(৩২)

তাওয়ীল ও জুহুল এবং এগুলো তাকফীরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণ

অডিও রেকর্ডের বিভিন্ন অংশে উল্লিখিত ভাই (শাইখ ফয়সাল) তাকফীরের প্রতিবন্ধকতা থেকে তাওয়ীলের বিষয়টি বার বার উপেক্ষা করেছেন। এই বক্তা বার বার ইহা প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, যে তাকফীর করে অথবা যে নির্দিষ্ট কোন কুফরী গুনাহ করে তাদের জন্য কোন অজুহাত নেই। কিন্তু এই আকীদা ভুল এবং একেবারেই ভিত্তিহীন। বরং আমরা ইসলামের মহান ইমামদের থেকে এখানে কিছু উদাহরণ এনে দেখাবো যে, আসলেই তাওয়ীল তাকফীরের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর নিকট এর গুরুত্বের কারণে ইহা সবসময়ই পরিচিত ছিল।

ইবনে কুদামাহ আল মাকদিসী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, “যেগুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমাহ আছে এবং যেগুলো মুসলমানদের মাঝে হারাম হিসেবে সুপরিচিত (কোরআন ও সুন্নাতের পরিষ্কার দলিলের কারণে) যেমন – শূকরের মাংস খাওয়া, ব্যভিচার করা এবং একই ধরনের মতবিরোধহীন বিষয়সমূহ, (সেইগুলির কোনটিকে যদি কোন ব্যক্তি হালাল মনে করে) তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। যেমন আমরা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলেছি যে নামাজ ত্যাগ করে। এবং যদি সে তাওয়ীল ছাড়াই শরীয়ত যাদেরকে রক্ষা করছে তাদেরকে হত্যা করে এবং তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়াকে হালাল মনে করে তাহলে বেশীর ভাগ আলেমই এদের ক্ষেত্রে কাফের হওয়ার ফাতোয়া জারি করেননি। যদিও তারা মুসলমান হত্যা করছে এবং তাদের ধনসম্পদ লুট করছে এই মনে করে যে এসব কাজ তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে।

এবং একইভাবে, এই আদেশও জারি করা হয়নি যে ইবনে মালজাম একজন কাফের ছিলেন, যদিও সে তার সময়ের সবচেয়ে সেরা ব্যক্তিত্বকে [ইমাম আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)] হত্যা করেছিল, যদিও সে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে যাচ্ছিল, এবং (তাদেরকেও কাফের বলা হয়নি) যারা (খারেজীরা) তার প্রশংসা করছিল এবং এই আমলে শরীক হবার কামনা করছিল। কারণ যখন তাওয়ীলের কারণে প্রত্যেক হারামকে হালাল বানানো হয় - ইহাই হচ্ছে নিয়ম।

---

(৩২)আল মুগনী, ২১০পৃষ্টা

ইহা বর্ণিত হয়েছে যে, একজন সাহাবী [কুদামাহ ইবনে মাজুন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)] মদকে হালাল মনে করে মদ খেয়েছিলেন, পরে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার উপর হদ জারি করেন তাকে কাফের সাব্যস্ত না করেই। এদিকে আবু জান্দাল ইবনে সুহাইল, যিনি শামে একদল মুসলমানের মাঝে মদ পান করেন, এখানেও তারা একে হালাল মনে করেছিলেন - তারা এই আয়াতকে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেছিলেন: ‘মুমিন এবং যারা সৎ কাজ করে তারা যা ইচ্ছা আহার করুক না কেন তাদের জন্য এর মধ্যে কোন ক্ষতি বা গুনাহ নেই।’ (সূরাহ্ আল মায়িদাহ, আয়াত: ৯৩)

এই লোকগুলোকে কাফের বলা হয় নি। তারা যখন জানতে পারলেন যে ইহা হারাম ছিল, তখন তারা তাওবা করেন এবং তাদের উপর হদ কায়েম করা হয়। তাই সবাইকে এই পদ্ধতিতে বিচার করা উচিত, অর্থাৎ তাওয়ীলের কারণে হারামকে হালাল গণ্য করলে কাফের বলা হবে না। একইভাবে প্রত্যেক অজ্ঞ ব্যক্তি, যার কাছে এই ধরনের বিষয় অজানা, তাকে সতর্ক করা এবং তার সংশয় নির্মূল করার আগ পর্যন্ত তাকে কাফের ঘোষনা করা উচিত নয়। তবে তাকে সংশোধনমূলক দলিল প্রদান ও সন্দেহ নিরশনের পরেও যদি সে ভুলটা ক্রমাগত করেই যেতে থাকে, তখন তাকে কাফের ঘোষণা দেয়া যেতে পারে কিন্তু তার আগে নয়।”(৩৩),(৩৪)

আসলে, মুসলমানদের রক্ত হালাল করে তাদের হত্যা করা এবং তাদের সম্পদ কেড়ে নেয়ার চেয়ে বড় কুফর আর কিইবা হতে পারে? এবং খারেজীরা তাই করেছিল, তারপরও বেশীর ভাগ ফকীহগণ তাদেরকে সবসময় ইসলামের বাইরে কাফের হিসেবে গণ্য করেননি। এর বদলে তারা মতামত দিয়েছিলেন যে খারেজীদেরকে খারেজী বিবেচনা করেই লড়াই করা হবে।

আর উপরে উল্লিখিত ইবনে কুদামাহ (রাহিমাহুল্লাহ) এর বক্তব্যের সেই মানুষদের বিষয়টা সবারই জানা, আর তা হলো এই যে তারা মদকে হালাল করে নিয়েছিলেন। তাদের নিজেদের অবস্থানের পক্ষে এমনকি তাদের দলিলও ছিল। তাই উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে কাফের হিসাবে গণ্য করেননি। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তারা কেন এমন করেছিলেন, পরে তাদের সামনে হুজ্জত প্রতিষ্ঠা করা হয় যে আল কোরআন ও সুন্নাতের ভিত্তিতে তারা ভুল করছিল। আসলে, উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে বলেছিলেন, “তোমরা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভুল করেছো। প্রকৃতপক্ষে তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহকে ভয় করে থাকতে (যা তাদের দেয়া সূরাহ্ মায়েদার ৯৩ আয়াতে বলা হয়েছিল), তাহলে তোমরা মদ থেকে দূরে থাকতে।”

অতঃপর তারা দলিল বুঝতে পারেন। এমন নয় যে, তাদেরকে দলিল দিয়েই উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকফীর করে ফেলেন। না, তারা দলিল বুঝেছিলেন যেন তাদের মনে কোন সংশয় না থাকে।

পরে তারা এর বিচার মেনে নেন, তাদের উপর মদ খাওয়ার জন্য হদ কায়েম করা হয়। এই কারণেই ইমামরা বলেন যে, অবশ্যই তাদের থেকে সংশয় দূর করতে হবে, যে কোন একজন এসে বললেই হবে না যে, আমি তার থেকে সংশয় নিরসন করেছি। কারো কাছে ব্যাখ্যা ছাড়াই একটা বিষয় পরিষ্কার মনে হতে পারে, কিন্তু যাকে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে তার কাছে তা পরিষ্কার, সন্তোষজনক এবং প্রাসংগিক নাও হতে পারে, যা হয়তো তার কাছে কিছু সংবাদ বা

---

(৩৩)আল মুগনী, ১০/৭০৯৮

(৩৪)এসব লোকদের কাছে শরীয়তের এর হুকুম বুঝানোর দায়িত্ব পালন করবেন সমাজের গ্রহণযোগ্য একটি প্যানেল – যারা আলেম কিংবা ইমাম হিসেবে বিশ্বস্থ ও সমাজে গ্রহণযোগ্য। ইহা এসব লোকদের কাছে ছেড়ে দিতে হবে কারণ তাদের তাকফীর বিষয়ক এবং গভীর ইসলামিক জ্ঞান আছে যেন তারা একটি বৈধ সিদ্ধান্তে অথবা রায়ে উপনীত হতে পারেন। একজন সাধারণ ব্যক্তি শুধু অন্যকে উপদেশ দিতে পারে। যেমন -তাদের বলা যে যদি তারা এই নির্দিষ্ট কাজ করতেই থাকে তাহলে তা কুফরের দিকে নিয়ে যাবে, কিন্তু এর বেশী মোটেও নয়, যেহেতু তাদের ইহা করার ব্যাপারে এবং যথাযথভাবে বিষয়টি তদন্তের কোন এখতিয়ার দেয়া হয় নি। যেমন আমরা এই উদাহরণে দেখলাম যে, মদকে হালাল মনে করার বিষয়টিকে কর্তৃত্ব ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে যথাযথ সম্ভব উপরের স্তরে (খলিফা) নেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সাধারণ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কাফের বলা হয় নি।

মতামতের বিষয় ছাড়া কিছুই নয়। এদের বিচার ফায়সালা এবং এই পদ্ধতি অবলম্বন করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত, যেমন: আমির, কাজী অথবা আলেমবৃন্দ বা এই রকম কারো কাছে।

শাইখ উল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন যে, "সাহাবারা ইমাম আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মতামতকে গ্রহণ করেন যেটাতে তিনি এই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, যদি তারা কাজটি (মদ খাওয়া) হারাম এবং গুনাহের বলে মেনে নেয় তবে তাদেরকে বেত্রাঘাত করা উচিত হবে কিন্তু যদি তারা ক্রমাগত একে হালাল হিসেবে ধরে নেয় তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে।"

শাইখ উল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) তাকফীর সংক্রান্ত বিষয়ে এবং নির্দিষ্টভাবে তাওয়ীলের ক্ষেত্রে আমাদেরকে এই বলে উপদেশ দিয়েছেন,

আর একইভাবে রয়েছে যে, 'যে কেউ তমুক কাজ করে, তবে সে হলো অমুক...।' আর নিশ্চয়ই ইহার স্বরূপই হলো সাধারণ/সর্বজনীন, আর সলফে সালেহীনগণ এরূপ সাধারণ/সর্বজনীন উক্তির ব্যবহার করেছেন, 'যে কেউ অমুক কথা বলে, তবে সে হলো অমুক...।' এভাবে এরূপ উক্তি সেই প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিবিশেষকে তার কথা বা আমলের জন্য তাকে বিচার ও শাস্তির হুমকির ভয়ে ভীত করে তুলে এবং তাকে তাওবা ও ভাল আমলের দিকে ধাবিত করে যা পূর্ববর্তী গুনাহকে মুছে দেয় বা যেই দোয়া গ্রহনযোগ্য হয় তার দিকে উৎসাহিত করে।

আর তাকফীরটি হলো হুমকির অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং সত্যিই যদি কেউ এরূপ কোন (কুফর) উক্তি করে থাকে যার ফলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলেছেন তা অস্বীকার করা হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি উক্তিটি করেছে সে তখন অমুসলমান অবস্থায় থেকে থাকে অথবা সে অনেক দূরবর্তী কোন মরুভূমিতে ছিল বা এরকম কিছু হয়ে থাকে, তবে সে যা অস্বীকার করেছে তার জন্য তার কুফর করা হয়নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার উপর হুজ্জত (প্রমাণ) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর যদি সেই ব্যক্তি তার ব্যাপারে দলিলসমূহ না শুনে থাকে, অথবা এমন হয় যে সে শুনেছে কিন্তু তার দৃষ্টিতে সেগুলো তার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি, অথবা সে সেগুলোর থেকে ফিরে যায়, আর সে এভাবে সেসকল দলিলসমূহের ব্যাখ্যা অনুসারে তার উপর যা বাধ্যতামূলক তা থেকে দূরে সরে যায়, এভাবে সে যদি গুনাহগার হয়ে থাকে, তবে আমি এই ব্যাপারে সেই হাদীসটি বলেছি যা দুইটি সহীহ্ হাদীসের গ্রন্থে রয়েছে, যেখানে এক ব্যক্তি বলেছে,

'যখন আমি মৃত্যুবরণ করবো, তখন আমাকে তোমরা পুড়িয়ে ফেলো, এরপরে আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে গুঁড়ায় পরিণত করে ফেলো, এরপরে সেই ভস্ম-গুঁড়াকে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিয়ো। কারণ যদি আল্লাহর ক্ষমতা থাকে তবে তিনি আমাকে এমন এক শাস্তির দ্বারা শাস্তি দিবেন যেরূপ শাস্তি মানবজাতির কাউকে পূর্বে কখনো দেয়া হয়নি।'

ফলে মানুষেরা সেই ব্যক্তির কথানুসারে সেরূপই করলো, পরে আল্লাহ তাকে বললেন, 'তুমি কি কারণে এমন করলে?' সে বললো, 'আপনার ভয়ে!' ফলে তিনি (আল্লাহ) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আর এই লোকটি আল্লাহর (পুনরুত্থান করার) ক্ষমতার ব্যাপারে এবং নিজের ভস্ম-গুঁড়া অবস্থা থেকে আবার ফিরে আসার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছিল। ইহা খুবই বিরোধী একটা চিন্তা, লোকটির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সে (মৃত অবস্থা থেকে) কখনোই ফিরে আসবে না, আর মুসলমানদের ঐকমত্য অনুসারে ইহা হলো কুফর।

কিন্তু লোকটি ছিল জাহেল (চরম অজ্ঞ) এবং সে তা জানতো না। আর লোকটি ছিল ঈমানদার, সে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করছিল। ফলে তিনি (আল্লাহ) তাকে (লোকটিকে) এ কারণে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। আর এই ব্যাখ্যাটি এসেছে

সেসকল ব্যক্তিদের থেকে যারা ইজতিহাদ করেন এবং যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনুসরণ করতে চান। সুতরাং এই উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, ক্ষমাশীলতাই অধিক প্রাধান্য পায়।”(৩৫)

আল্লাহ কর্তৃক পুনরুত্থান এবং আল্লাহর মৃতকে জীবিত করতে পারার ক্ষমতাকে অস্বীকার করা কি কুফর নয়? ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এর মতে উক্ত হাদীসের লোকটি তাই করেছিল। তাহলে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে যাকে একটা দলিল দেয়া হয়েছে এবং এরপর সে তা পরিত্যাগ করে? সে কি সবচেয়ে বড় কাফের নয়? আমরা যদি এক্ষেত্রে ভাই ফয়সালের মানহাজের অনুসারী হই তাহলে এই রকমই মনে হতে পারে, কিন্তু আহলে সুন্নাহ্‌র কাছে ব্যাপারটা এরকম নয়। কারণ ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, “আর যদি সেই ব্যক্তি তার ব্যাপারে দলিলসমূহ না শুনে থাকে, অথবা এমন হয় যে সে শুনেছে কিন্তু তার দৃষ্টিতে সেগুলো তার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি, অথবা সে সেগুলোর থেকে ফিরে যায়, আর সে এভাবে সেসকল দলিলসমূহের ব্যাখ্যা অনুসারে তার উপর যা বাধ্যতামূলক তা থেকে দূরে সরে যায়,…।”

সুতরাং, যে ব্যক্তি তাওয়ীল করছে তার কাছে যে দলিলই আপনি উপস্থাপন করেন না কেন, তা তার কাছে চূড়ান্ত মনে নাও হতে পারে। ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন নি যে, আপনার দৃষ্টিতে সেগুলো তার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, বরং, তিনি বলেছেন যে, তার দৃষ্টিতে সেগুলো তার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তাকেই এই দলিলগুলো অবশ্যই বুঝতে হবে এবং এরপরে এগুলোর উপর আমল করতে হবে। সুতরাং একজন ব্যক্তির কাছে কিছু আয়াতের উপস্থাপনের ফলে ইহা জরুরি না যে, সে সাথে সাথে এগুলোর উপর আমল করা শুরু করবে অথবা, সে সেই অনুযায়ী আমল করা শুরু না করলে তার উপরে কুফরের লেবেল লাগানো বাধ্যতামূলক নয়; কারণ হতে পারে তার বুঝতে পারার অক্ষমতা অথবা তার তাওয়ীল তাকে সেসকল দলিলের উপর আমল করতে অপারগ করছে।

এখানে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) আমাদেরকে আরও কিছু চিন্তার খোরাক যোগাচ্ছেন,

“তাকফীর করতে গেলে সঠিক এবং যথাযথ কর্মপদ্ধতিটি হলো, হক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মাতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই ইজতিহাদ (কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর আয়াতসমূহের দ্বারা যা বুঝাতে চেয়েছেন এবং সেই অনুসারে যে ধরনের আমলের সম্পাদনা তিনি আমাদের থেকে চেয়েছেন, তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কারো সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে ইজতিহাদ বলে) করে, তাহলে সে ভুল করে বসলেও সেক্ষেত্রে সে কাফের হবে না। বরং তার ভুলকে ক্ষমা করা হবে। তবে কারো কাছে যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ওহী হওয়া যে কোন বিষয় পরিষ্কার রূপে পৌঁছানোর পরও সে তার বিরোধীতা করতে থাকে এবং মুমিনদের রাস্তা বাদ দিয়ে অন্য কোন পথ ধরে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

আর যে ব্যক্তিই নিজের নফসের অনুসারী হয় এবং এর ফলে সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে ব্যর্থ হয় এবং ইলম ছাড়া কথাবার্তা বলে, তাহলে সে একজন অবাধ্য ও গুনাহগার ব্যক্তি, এবং সে ফাসেকও হতে পারে। আবার তার ভাল আমলও থাকতে পারে যা তার খারাপ আমলগুলোর চাইতে ওজনে অধিক হতে পারে।

সুতরাং, তাকফীর মানুষের পরিস্থিতিভেদে বিভিন্ন হতে পারে। প্রত্যেক বিভ্রান্ত ব্যক্তিই (হোক সে বেদাতী, অজ্ঞ অথবা পথভ্রষ্ট) তার কৃত কর্মের দ্বারা কাফের হয়ে যায় না।(৩৬)

---

(৩৫)মাজমু' আল ফাতাওয়া, ভলিউম: ০৩, পৃষ্ঠা: ২১৯-২৩১

(৩৬)মাজমু আল ফাতাওয়া ১২/১৮০

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) তাওয়ীল এবং তাকফীর সংক্রান্ত বিষয়ে এই কথা বলে শেষ করেন,

“প্রকৃতপক্ষে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা থেকে আমরা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে জানি যে, তিনি তাঁর উম্মাতের জন্য মৃতকে ডাকা হালাল করেননি, হোক সে নবী, বুজুর্গ ব্যক্তি অথবা অন্য যে কেউ। আর না তিনি এদের কাছ থেকে বা এদের ছাড়া অন্য (আল্লাহ ব্যতীত) কারো কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার পক্ষে কোন কথা বা বিবৃতি রেখে গিয়েছেন।

আর না তিনি এদের কাছে বা এদের ছাড়া অন্য (আল্লাহ ব্যতীত) কারো কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার পক্ষে কোন কথা বা বিবৃতি রেখে গিয়েছেন, ঠিক যেমন তিনি তাঁর উম্মাতের জন্য মৃতকে অথবা মৃত ছাড়া অন্য (আল্লাহ ব্যতীত) কিছুকে অথবা এই ধরনের কোন কিছুকে সেজদা করা হালাল করেননি। বরং আমরা জানি যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই সকল বিষয়ই নিষিদ্ধ করেছেন এবং ঐ সকল বিষয়ও নিষিদ্ধ করেছেন যেগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হারাম করেছেন।

কিন্তু জুহুল (অজ্ঞতা) থাকার কারণে এবং পরবর্তী প্রজন্মের বেশীর ভাগ লোকের কাছে ওহীর জ্ঞানের কমতি থাকার কারণে এসব বিষয়ে তাদেরকে তাকফীর করা সম্ভব হচ্ছে না যতক্ষণ না তাদের কাছে তা পরিষ্কার করে তুলে ধরা যাচ্ছে যা নিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমন করেছিলেন এবং ঐসব বিষয় যা তাকফীরকে প্রতিহত করছে।”(৩৭)

শাইখ উল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ) তার সময়ের কবর পূজারীদের নিয়ে একই সমস্যায় পড়েছিলেন। তাঁর সন্তান ও অনুসারীদের থেকে এই কথা তাঁর ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে,

“ইতিমধ্যে তিনি উম্মাতের উলামাগণের সাথে আলোচনা করে এবং তাঁদের সম্মতিক্রমে অজ্ঞতার অজুহাত প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। আর হুজ্জত এর (প্রমাণ) প্রতিষ্ঠা এবং তা পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হওয়া ব্যতীত তিনি কাউকে তাকফীর করেননি। এমনকি যে সকল অজ্ঞ লোকেরা তাদের অজ্ঞতার কারণে কবরের পূজা করে তাদেরকে তিনি তাকফীর করা হতে বিরত থেকেছেন যখন ঐ লোকদেরকে বুঝানো (তারা যে কাজটি করছে তা হারাম) তাঁর জন্য সহজ হয় নি।”(৩৮)

যারা ইহা পড়ছেন আমরা ঐসব মুসলমানদের জিজ্ঞেস করতে চাই যে, কবরে যাওয়া এবং সেজদা করা, অথবা কোন মানুষের দিকে রুকু করার চাইতে প্রকাশ্য কুফর আর কি হতে পারে? আর মৃতের কাছে সাহায্য চাওয়া, তাদের কাছে আশ্রয় চাওয়া, তাদেরকে ডাকার মাধ্যমে দুনিয়ায় উপকৃত হবার আশা করা, অথবা মন্দিরের মত তাদের কবরে প্রবেশের জন্য অর্থ নেয়া, এগুলোর চেয়ে পরিষ্কার কুফর আর কী হতে পারে?

কিন্তু আমরা এখানে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ থেকে যা শিখলাম তাহলো, কোন কোন সময় কিছু মানুষ যখন এধরনের কাজ করে তখন অজ্ঞতা এবং তাওয়ীলের প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে তাদেরকে ছাড় দেয়া হয়। সুবহানাল্লাহ! ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) একসময় এমনকি ইহাও বলেন যে, এই লোকগুলোকে তাকফীর করা “সম্ভব হচ্ছে না”! কেন? তা ছিল অজ্ঞতা এবং তাওয়ীলের প্রতিবন্ধকতার কারণে, যা আমরা এতক্ষণ আহলে সুন্নাহর উভয় ইমাম থেকে আলোচনা করেছি।

---

(৩৭)আর-রাদআলালকুবরা পৃ.৩৭৬

(৩৮)মিসবাহ উয-যুল্লামফির-রাদ পৃ৩২৪-৩২৫

ইতিহাসে এরকম অনেকবারই দেখা গেছে যখন কেউ পরিষ্কার কুফর বলেছে বা করেছে তবুও আলেমরা তাদের ইখলাসের দিকে নজর দেয়ার ফলে ছাড় দেন। যার একটি পরিষ্কার উদাহরণ হলো, আল হাল্লাজ ইবনে ইউসুফের কাহিনী। সে তার সময়কার একজন আলেম ছিল এবং ইসলামী আধ্যাত্মিক আন্দোলনের অগ্রগামী ব্যক্তি ছিল। সে কিছু আলেমের কাছ থেকে এমন সব শিক্ষা নিচ্ছিল যা ছিল বেশ বিভ্রান্তিকর। যেহেতু তাকে এগুলো শিখানো হচ্ছিল, আর কিছু আলেমের মতে সে ছিল একজন উন্মাদ, এক পর্যায়ে সে জনসম্মুখে এই দাবি করে যে, “আনাল হক!” [আমি চূড়ান্ত সত্য (মানে আল্লাহ)]। তাকে একারণে বিচারের সম্মুখীন হতে হয় এবং পরে তার ঐ বিবৃতির জন্য তাকে শূলে বিদ্ধ করা হয়। তবে তার মৃত্যুর ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

এর একটি উদাহরণ ছিলেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এবং তিনি তার ব্যাপারে বলেন,

“এবং ইতিমধ্যেই কিছু বেদাতী এবং পথভ্রষ্ট মানুষের দল পাওয়া যাচ্ছিল যারা তাদের (তাসাউফ চর্চাকারী সুফী মানুষজন) প্রতি বায়াতের দাবি করছিল, কিন্তু যারা তাসাউফ চর্চাকারী লোকদের মনযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছেন তারা দেখেছেন যে এরা (আহলুল বেদাত, অর্থাৎ, বেদাতী ও পথভ্রষ্ট মানুষের দল) উনাদের (সুফীদের) অন্তর্ভুক্ত নয়, যেমন আল হাল্লাজ।

তাই প্রকৃতপক্ষে এই পথের (তাসাউফের) বেশীর ভাগ শাইখ তাকে (আল হাল্লাজকে) পরিত্যাগ ও বর্জন করেছেন। যেমন আল জুনায়েদ, যিনি এই পথের (তাসাওউফের) একজন শিক্ষক এবং অন্যান্যরা - যা শাইখ আবু আব্দুর রাহমান আস সালামী তার তাবাকাত আস সুফিয়্যাহ এবং শাইখ আল হাফিজ আবু বকর আল খতিব তার তারিখুল বাগদাদ কিতাবে বর্ণনা করেছেন।”(৩৯)

কিন্তু ইমাম মুওয়াফ্‌ফাক উদ দ্বীন ইমাম ইবনুল জাওযী, ইমাম আল হারাবী এবং ইমাম ইবনে আকিল (রাহিমাহুমুল্লাহ) তাকে (আল হাল্লাজকে) তার আংশিক অপ্রকৃতস্থতা ও তাওয়ীল এর জন্য ছাড় দেন, কেননা তারা তাকে এভাবে দেখেন যে, তিনি একজন একনিষ্ঠ ইমাম ছিলেন যিনি পরবর্তীতে বিভ্রান্ত হয়েছেন। আর এই ভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাকফীরের ব্যাপার আমাদের সামনে আসতে পারে যখন কোন ব্যক্তিবিশেষ যে সকল ক্ষেত্রে কুফর করেছে তার বিষয়গুলো অনুধাবন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং কিছু কিছু সময়ে অজ্ঞতা ও তাওয়ীলের অজুহাত প্রদান কোন কোন আলেমের কাছে সঠিক মনে হয় আবার কোন কোন আলেমের কাছে তা মনে হয় না।

একই বিষয় ইমাম আলি ইবনে হুসাইন ইবনে সিনা, ইমাম ইবনে রুশদ, ইমাম আয যামাখশারী, ইমাম আয জারখাশী এবং আরও অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ওনারা এবং এমন আরও অনেকেই আছেন যাদের জীবনের কোন কোন বিবৃতি এবং কার্যকলাপের কারণে তাদেরকে কাফের শ্রেনীতে রাখা হবে কি না – এ নিয়ে অনেক ধরনের কথা আছে।

কিন্তু তাদের ব্যাপারে সবাই (আহলে সুন্নাহ) একটি সাধারণ মত পোষণ করেন, আর তা হলো - তারা যে ভুলগুলো করেছিলেন তা প্রতিহত করা এবং তারা যে ভাল কাজগুলো করেছিলেন তার প্রশংসা করা। সুতরাং, তাকফীর আল মুয়াইয়িনের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য থাকতে পারে যা আমরা ইতিপূর্বে আগের অধ্যায়গুলোতে এবং আমাদের বই “খাওয়ারিজ এবং জিহাদ” এ বর্ণনা করেছি, কারণ এক্ষেত্রে বিষয়টির পরিসমাপ্তি বা উপসংহারে পৌঁছানো হয় ইজতিহাদের মাধ্যমে।

---

(৩৯)মাজমু ‘আল ফাতওয়া, কিতাবুত তাসাওউফ, ভ.১১

মনে হয় অনেকেই ইমাম সালাহ উদ দ্বীন আইয়্যুবীর কিছু বিষয়ে জানেন না, যিনি মুসলমানদের কাছে একজন বীর যোদ্ধা হিসাবে বিখ্যাত, কিন্তু উনার ব্যাপারেও কিছু বিষয় আছে যা মানুষ জানে না। এর মধ্যের একটি হল, তিনি ফাতেমী খিলাফতের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন যখন তারা মিশরে ক্ষমতাসীন ছিল। যারা ফাতেমীদের বিষয়ে জানেন না তাদের জ্ঞাতার্থে বলা যায়, এরা ছিল ১২ ইমামে বিশ্বাসী শিয়াদের একটি চরমপন্থী অংশ। তারা এতো উদ্ভট ছিল যে তারা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত সম্মান এবং তাদের অন্যান্য ইমামদের পূজা করতে গিয়ে তাদের সব মসজিদের কিবলা মক্কা থেকে ফিরিয়ে ইরাকের কারবালার দিকে করে ফেলে।

আজও যদি কেউ উত্তর আফ্রিকা এবং সিরিয়ার কিছু অংশে যায় তবে সেখানে তাদের মসজিদগুলো দেখতে পাবে। যদিও সালাহ উদ দ্বীন আইয়্যুবী (রাহিমাহুল্লাহ) তাদের একটা অংশের হয়ে কাজ করছিলেন কিন্তু তিনি তাদের সবাইকে কাফের বলেননি। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এ কারণে কেউ তাকে কাফের বলেনি। ইহা এই কারণ হল, তিনি ব্যাখ্যা করছিলেন যে তিনি প্রশাসনের মধ্যে ঢুকে সেখান থেকে একে পরিবর্তনের চেষ্টা চালাবেন। ইহা উনার তাওয়ীল ছিল যা অনেক আলেম কর্তৃক আলোচিত হয় কিন্তু এজন্য তাকে কাফের ঘোষনা দেয়া হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে মরক্কো, আলজেরিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য অংশে কিছু আলেম ছিলেন যারা ফাতেমীদের সমর্থক হওয়ার ভান করতেন যাতে তারা উক্ত ব্যবস্থার ভিতরে ঢুকে যেতে পারেন, ফাতেমীদের কটাক্ষ করতে পারেন এবং জনগণকে সচেতন করে এদের মাধ্যমে তাদেরকে সরিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু কেউই এসব আলেমদের কাফের বলেননি, তাদেরকে বিশ্বাসঘাতকও বলা হয় না। কারণ তাদের তাওয়ীল ছিল এমন এক ব্যাপার যা সবার কাছে জানা ছিল কিন্তু গ্রহণীয় ছিল না।

ইমাম আল আইয়্যুবীর (রাহিমাহুল্লাহ) আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু ভুল ভ্রান্তি ছিল কিন্তু শাইখ উল ইসলাম মুওয়াফ্‌ফাক উদ দ্বীন, শাইখ আবু উমর এবং শাইখ আবু মুহাম্মাদ (রাহিমাহুমুল্লাহ) তাঁর সাথে পবিত্রভূমিকে খ্রিষ্টানদের থেকে মুক্ত করার জন্য এক সাথে লড়াই করেন। কিন্তু এই যুদ্ধগুলোর মাঝেই আলাদাভাবে তাঁকে সংশোধনের জন্য উপদেশ দান জারি ছিল। একই ব্যাপার ছিল লিবিয়ার শাইখ উমর মুখতার (রাহিমাহুল্লাহ), আলজেরিয়ার শাইখ আব্দুল কাদির আস সুফী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং মরক্কোতে রিফিয়্যাহ আন্দোলনের শাইখ আব্দুল করিম (রাহিমাহুল্লাহ) প্রমুখ ব্যক্তিদের।

এই লোকদের আকীদাতে এমন কিছু বিষয় ছিল যার কারণে আহলে সুন্নাহ তাদেরকে সাবধান করেছিলেন, কিন্তু তাদেরকে তাওয়ীলের কারণে ব্যাপকভাবে ছাড় দেয়া হয়। একই ঘটনা ইমাম আন নববী (রাহিমাহুল্লাহ), ইমাম ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ), ইমাম ইবনে দাকিক আল ঈদ (রাহিমাহুল্লাহ) সহ অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কিন্তু আমরা যদি ভাই ফয়সালের পরামর্শ গ্রহন করে সবাইকে ‘মেশিনগান তাকফীর’ করি তবে এই উম্মাতের খুব কম মুসলমান বা উলামাগণ তাকফীর থেকে রেহাই পাবেন। আর শুধু বাকী থাকবেন সাপ্তাহিক ছুটিতে একত্রিত হওয়া ‘পূর্ব লন্ডনের ডেভেনান্ট সেন্টার’ এর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ।

পরিশেষে ইহা বলাই যথেষ্ট যে, তাকফীরের জন্য অজ্ঞতা এবং তাওয়ীল হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা যা উপরের বিবৃতিগুলো এবং ঐতিহাসিক বিষয়াবলীর প্রেক্ষিতে প্রমাণিত এমন এক ব্যাপার যা সহজে যুক্তির দ্বারা বোঝানো যায় এবং সংক্ষিপ্ততার জন্য আমরা আমাদের বক্তব্য এবং উদাহরণ পেশ করা শেষ করছি।

=====***=====

তাকফীর এর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর নীতি

ইদানিং দেখা যায় বিভিন্ন বিতর্ক-বাহাসে এক পক্ষ অপর পক্ষের যে কোন মতপার্থক্যের কারণে তাকফীর করে বসে। তাই যখনই তাকফীর বিষয়ে কোন আলোচনা কিংবা বিতর্ক হয়েছে, তখন হয় অপর পক্ষের তাকফীর করার মাধ্যমে অথবা বড় কোন ফিত্‌নার মাধ্যমে তা শেষ হয়েছে। এই একই রোগে জর্জরিত ছিল খারেজীরা। যে কোন মূলনীতি নিয়ে কারো সাথে মতপার্থক্য হলেই তারা তাকে কাফের ঘোষণা দিতো। আমরা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর নীতির আলোকে যে কোন বিতর্ক-বাহাসের সুষ্ঠুরুপ আলোচনা করতে চাই। এজন্য আমরা যে বিতর্কটি বেছে নিয়েছি তা ফিকহের দুই ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আশ শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) এর মাঝে সংগঠিত হয়।

বিতর্কটি ছিল ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে হুকুমের ক্ষেত্রে যে নামাজ ছেড়ে দিয়েছিল, আর আদায় করেনি। ইহা ইতিহাসের অন্যতম একটা বিতর্ক ছিল। এক্ষেত্রে ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) তার মুসনাদে সংকলিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঐ হাদীস নিয়েছেন যেখানে বলা হয়েছে: "যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দিয়েছে, সে কাফের।" এছাড়াও ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) আরও একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দেয়, সে মুশরিক।" এ কারণে ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) এই উপসংহারে পৌঁছান যে, যে ব্যক্তি নামাজ পুরোপুরি ছেড়ে দেয়, সে কাফের।

ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) এর বক্তব্যের উত্তরে ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, সে যদি কাফের হয়ে থাকে, সে কিভাবে আবার ইসলামে আসবে? ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) উত্তর দেন যে, সে আবার কালেমা শাহাদাত পাঠ করবে। ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) উত্তর দেন যে, সে তো ইতিমধ্যে শাহাদাহ পাঠ করেছে এবং কখনো ইহাকে অস্বীকার করেনি। তার মানে ইহা প্রমাণিত হয় যে, সে এখনো মুসলমান। উক্ত বিতর্কের পরও ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) দুজনেই নিজ নিজ মতামত ও সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

(উল্লেখ্য: এক্ষেত্রে ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) সঠিক মতের উপর ছিলেন কারণ তিনি সুস্পষ্ট দলিল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় কিভাবে ঐ ব্যক্তি পুনরায় ইসলামে আসবে, তখন তিনি উত্তরটা সঠিকভাবে দিতে পারেন নি। এর সঠিক উপায় হলো: ইসলামে পুনরায় প্রবেশ করার জন্য তাকে তাওবা করতে হবে এবং নামাজ পড়া শুরু করতে হবে। ইহা সাধারণভাবে আলেমরা জানেন যে, কেউ যে সব কারণে মুর্তাদ হয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, তাকে আবার ইসলামে আসতে হলে, ঐসব কারণ সংশোধন করে আসতে হবে। যেমন শরীয়ত বিরোধী আইনে বিচার-ফায়সালা করা কিংবা আইন-প্রণয়ন করা শিরক ও কুফর। কেউ যদি ইহা করে তবে সে কাফের ও মুশরিক হয়ে যায়। এখন তাকে আবার ইসলামে প্রবেশ করতে হলে তাকে হজ্জ্ব কিংবা উমরায় যেতে হবে না বরং তাকে এই শিরক ও কুফর পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু ইদানিং শাসকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা অনেক শিরক-কুফরে লিপ্ত। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য বছর-বছর তারা হজ্জ্ব-উমরাহ করে আসে। কিন্তু এসব হজ্জ্ব-উমরাহ তাদের এসব কুফরী দূর করবে না, বরং তাদেরকে ঐ শিরক-কুফর পরিত্যাগ করতে হবে যা ক্রমাগত করে যাওয়া ও অব্যাহত রাখার মাধ্যমে তারা ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে।)

এই বিতর্ক থেকে আমরা নিম্নলিখিত বিষয় শিখতে পারিঃ

ক) যে কোন বাহাস কিংবা বিতর্কে সত্য যাচাই করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিলটাই প্রাধান্য পায়। বিতর্কে উপস্থিত ব্যক্তির মর্যাদার দিকে মনযোগ না দিয়ে বরং সবার উচিত সবচেয়ে শক্তিশালী দলিলের দিকে মনযোগ

দেয়া। এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) এর দলিল সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল, তাই তার মতটাই সত্যের অধিক নিকটবর্তী ছিল।

খ) যদিও তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে এবং বিতর্কের পরও যার যার মতে অটল থেকেছেন, কিন্তু ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) কখনো ইহা বলেন নি যে, যেহেতু ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) তার দেয়া দলিল মানেননি তাই তিনি কাফের। অথবা ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ইহা বলেন নি যে, যেহেতু ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) তার দেয়া দলিলের সাথে একমত হননি, তাই তিনি কাফের। যদিও তাদের বিতর্ক এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ছিল।

বর্তমানে ইহাই সমস্যা। যখনি একপক্ষের দেয়া আম (General) কোন আয়াতকে অপরপক্ষ ঐ বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য মনে করছে না কিংবা কোন আয়াতের ভুল প্রয়োগের কারণে ঐ পরিস্থিতির জন্য ঐ আয়াতকে প্রযোজ্য মনে করছে না, তখনই অপর পক্ষ আল কোরআন না মানার অজুহাত দেখিয়ে তাকফীর করছে।

গ) ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ), ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) কে তাকফীর করতে চাওয়ার কারণে খারেজী বলে আখ্যায়িত করেননি। একইভাবে তাকফীর করতে চান নি বলে ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) কে ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) মুর্জিয়া বলে আখ্যায়িত করেন নি।

(মুর্জিয়া হচ্ছে ঐসকল লোক যারা আমলকে ঈমানের অংশ মনে করে না। বরং তারা শুধু 'তাসদীক' বা অন্তরে বিশ্বাস করাকে ঈমান মনে করে। আর তারা আল কোরআনের কিছু আয়াতকে সম্পূর্ণ অর্থহীন করে দেয় যেগুলোতে যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আইন পরিবর্তন করে তারা কাফের বলে উল্লেখ আছে। আর কোন কোন সময় কাজের ক্ষেত্রে কুফরও মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।)

অথবা ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) ইহাও বলেননি যে, যেহেতু ইমাম শাফেঈ কাফেরকে কাফের বলেননি, তাই তিনি নিজেই কাফের। এই বিতর্ক থেকে আমরা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখতে পারি, তা হলো: এই বিতর্কে যে তাকফীর নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো সেটা ছিল একজন আলিমের ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে তাকফীর। এক্ষেত্রে আম (সাধারণ) নস্ থেকে যে উপসংহার বা হুকুম বের করা হয়েছে কিংবা যে ইজতিহাদ করা হয়েছে, তা পরিস্থিতি এবং উপস্থিত দলিলের কারণে এক আলেম থেকে অন্য আলেমের ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে।

ঘ) তারা দুজনে তাকফীর আল ইজতিহাদ নিয়ে কথা বলছিলেন। ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) আল কোরআনের আয়াতসমূহের উপর ভিত্তি করে ইহা মনে করেননি যে নামাজ পরিত্যাগকারীকে তাকফীর করা যায়। অন্যদিকে ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) সেটা সঠিক মনে করেছেন।

এখান থেকে ইহা বুঝা যায় যে, তাকফীর আল ইজতিহাদের ক্ষেত্রে দুই ব্যক্তির মতপার্থক্য হতে পারে। তার মানে এই নয় যে, তাদের মধ্যে একজন খারেজী আর অপরজন মুর্জিয়া অথবা বিভ্রান্ত অথবা কাফের। ইহা শুধু এতটুকুই প্রমাণ করে যে, দুই জন বিভিন্ন দলিলের উপর ভিত্তি করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। অথবা ইহা হতে পারে যে, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে একজন ব্যক্তি অন্যজন থেকে বেশী জ্ঞান রাখেন তাই তিনি একটা হুকুমকে সঠিক মনে করেন। যেমন ঘটেছিল ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) এর ক্ষেত্রে। ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) এর শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও নামাজ পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) সত্যের অধিক নিকটবর্তী ছিলেন।

ঙ) যদি দলিল যাচাই-বাছাই এর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এর নীতি অনুসরণ করেন তখন বিতর্কের কারণে একে অন্যকে মুর্জিয়া-খারেজী কিংবা কাফের আখ্যা দেয়া সঠিক নয়। তাই কেউ যদি কোন আম আয়াত ব্যবহার করে তাকফীর করতে চায় আর অন্য কেউ যদি তার সাথে এই ব্যাপারে মতপার্থক্য করে যে এখানে কুফর

নেই, তবে তাকে তাকফীর করা যাবে না, যদিও প্রথম ব্যক্তি মনে করে যে এই আয়াত থেকে এই পরিস্থিতিতে কুফর প্রমাণিত হয়। বরং ইহা (তাকফীর আল ইজতিহাদে ভিন্নমতাবলম্বীকেও তাকফীর করে ফেলা) খারেজীদের পদ্ধতি। তাকফীর উল মুয়াইয়িন ও তাকফীর উল ইজতিহাদের ক্ষেত্রে সকল দলিল যাচাই-বাছাই করতে হয়, আর যদি এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য থাকে তবে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে সঠিক মতটাই গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু তাকফীর উন নসে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ কোন মতপার্থক্য করেন না। যেমন: কোরআনের আয়াত কিংবা হাদীসে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, ইহুদী-খ্রীষ্টান কিংবা আবু লাহাব হচ্ছে কাফের।

তাকফীরের সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে ভুল ব্যাখ্যা (তাওয়ীল)। তাই কারো কোন ভুল ব্যাখ্যা থাকলে তাকে তাকফীর করার আগে সুযোগ দেয়া হয়। এর মানে এই নয় যে, কুফরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হবে না কিংবা কুফরের বিরোধীতা করা হবে না। বরং, এর অর্থ হচ্ছে যারাই আমাদের সাথে মতপার্থক্য করবে তাদের সবাইকে আমরা তাকফীর করি না।

=====***=====

এই ধারণা করা যে - বর্তমানে বেশীরভাগ মুসলমানই কাফের: অল্প কিছু মুসলমান আমলকারী আর ৯৫ %মুসলমানই কাফের!!!

ভাই ফয়সাল তার "মুর্জিয়াদের শয়তানিপূর্ণ প্রতারণা" ক্যাসেটের খ বিভাগ এ বলেন:

"...একজন মানুষের জন্য দ্বীনের ভিতরে প্রবেশ করার চাইতে দ্বীনের ভিতর থেকে বেরিয়ে যাওয়াই সহজ। কারণ যখন আপনি দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করেন তখন আপনি বিভিন্ন পিছুটানের দ্বারা দোদুল্যমান হয়ে পড়েন, যেমন: 'হায়! আমাকে আজ জেনিফারের মায়া ত্যাগ করতে হবে', 'হায়! আমাকে আজ হেইনিকেনের মায়া ছাড়তে হবে', 'হায়! আজ আমার জাতীয় লটারীর লোভ থেকে মুক্ত হতে হবে' ইত্যাদি। এভাবে আপনি দ্বীনের ভেতর সম্পূর্নরূপে প্রবেশ করতে গিয়ে হিমশিম খান। অপরদিকে, দ্বীন ইসলামকে কিন্তু মুহূর্তের মাঝেই ত্যাগ করা সম্ভব, কারণ আপনি আপনার আকাঙ্ক্ষা, আপনার শয়তানিপূর্ণ আসক্তির লোভে দ্বীন ত্যাগ করেন! তাই আপনার জন্য দ্বীন ইসলামের ভিতরে প্রবেশ করার চাইতে দ্বীন ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়াই বেশী সহজ। আর ঠিক এই কারণেই আপনি দ্বীন ইসলামের ভিতরে অবস্থানকারী মুসলমানদের চাইতে দ্বীন ইসলামের বাহিরেই বেশীরভাগ মুসলমানদেরকে দেখতে পাবেন। বেশীরভাগ মুসলমানই আমল করা ছেড়ে দিয়েছেন। অল্প সংখ্যক মুসলমান আজ আমল করছে। খুবই অল্প সংখ্যক মুসলমান আজ আমল করছে।"

মুর্জিয়াদের শয়তানিপূর্ণ প্রতারণা: ক বিভাগ।

"আমাকে আনুমানিক দুই বছর পূর্বে এই প্রসঙ্গে লিখতে বলা হয়েছিল, যে প্রসঙ্গে আমরা এখন আলোচনা করবো। আর যে কারণে ভাইয়েরা ও বোনেরা এই বিষয়ে আমাকে লিখতে অনুরোধ করেছেন, তা হলো একটি ভয়াবহ ব্যাধির স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়া, যা সত্যিই খুবই বিপজ্জনক একটি ব্যাধি। এই ব্যাধিটি ক্যান্সার কিংবা এইডস-এর চাইতেও মারাত্মক ব্যাধি, আপনার জীবনে দেখা যে কোন মন্দ ব্যাধির চাইতে ইহা অনেক বেশী নিকৃষ্ট একটি ব্যাধি। আর অতি দুঃখজনকভাবে উম্মাতের ৯৫% মুসলমানই এই ভয়ংকর ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত। ভেবে দেখেছেন কি? উম্মাতের ৯৫% মুসলমান! আফ্রিকা, এশিয়া, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ইত্যাদি যেখানেই যান না কেন, মুসলমান বসতিপূর্ণ যে কোন স্থানের ৯৫% মুসলমানই এই কঠিন ব্যাধির দ্বারা তীব্রভাবে আক্রান্ত হয়ে আছে। আর এই ব্যাধিটির নাম হলো ইরজা, যার মানে হলো উদারনীতি (ইংরেজীতে লিবেরালিজম)। তাই আজকের টপিকের নাম হলঃ মুর্জিয়াদের (উদারপন্থীদের) শয়তানিপূর্ণ প্রতারণা।"

আমরা কি করে এই ধরনের মানুষদের কথাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে পারি যখন তারা প্রচুর মিথ্যা কথা বলে এবং সেই সাথে উম্মাতের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে? আজকে তাদের মনের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে তাকফীরের ন্যায় গুরুতর বিষয়কে ব্যবহার করা হয়, আর তাদের এরূপ কাজের ফলাফলের ধকল সইতে হয় সমগ্র উম্মাতের, (তাদের কথার ভাব শুনলে মনে হবে) যেন সমগ্র উম্মাতই বেঈমান হয়ে পড়েছে। কিন্তু যে উম্মাতের উপরে আল্লাহর রহ্মত আছে সেই উম্মাতের ব্যাপারে আমরা কিভাবে এরূপ কথা বলতে পারি!

যে উম্মাত সবার শেষে এই পৃথিবীতে এসেছে কিন্তু পুনরুত্থানের দিনে সবার চাইতে বেশী প্রাধান্য পাবে সেই উম্মাতের ব্যাপারে আমরা কিভাবে এই ধরনের নির্বিকার নির্লজ্জ মন্তব্য করি? হয়তো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যে উক্তিটি আমরা ভুলে বসেছি সেটা আবার মনে করতে হবে, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা দিয়েছিলেন,

إن الله تعلى قد أجاز أمتي أن تجمع على ضلالة

আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,**“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমার উম্মাতকে পথভ্রষ্টতার উপর সমবেত হওয়া থেকে বিরত রেখেছেন।”**(৪০)

إن الله تعلى لايجمع أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة

ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,**“নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মাতকে পথভ্রষ্টতার উপরে সমবেত করবেন না। আর আল্লাহর হাত রয়েছে জামাতের উপর।”**(৪১)

أن اهل الجنة عشرون ومائة صف هذه الأمة منها ثمانون صفا

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) তার সহীহ মুসলিমের শরহে ব্যাখ্যা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, **“তিনি দেখেছেন যে, জান্নাতে মানুষদের ১২০টি সারি রয়েছে এবং এর মাঝে ৮০টি সারিই ছিল এই উম্মাতের থেকে।”**(৪২)

عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم اترضون أن تكونو اربع أهل الجنة قال فكبرنا ثم قال أم اترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فكبرنا ثم قال إني لأرجوأن تكونوا شطرأهل الجنة

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **“তোমরা জান্নাতের এক-চতুর্থাংশ মানুষ হয়ে থাকলে এতে কি তোমরা খুশী হবে?”** তিনি (ইবনে মাসঊদ) বললেন, “আমরা বললাম, আল্লাহু আকবার!” তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, **“তোমরা জান্নাতের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ হয়ে থাকলে এতে কি তোমরা খুশী হবে?”** তিনি (ইবনে মাসঊদ) বললেন, “আমরা বললাম, আল্লাহু আকবার!” তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, **“নিশ্চয়ই আমি আশা করি যে, তোমরা জান্নাতের মানুষদের অর্ধাংশ হবে।”**(৪৩)

জান্নাতের মানুষদের মাঝে এই উম্মাতকেই সবচাইতে বেশী বানানোর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের উপর কত বড় অনুগ্রহই না করেছেন! অথচ এরপরেও কিছু মানুষ এই অনুগ্রহকে ধ্বংসের চেষ্টায় লিপ্ত এবং তারা সাধারণ মুসলমানদেরকে তাকফীরসহ এমনসব বিষয়ের দায়িত্বে নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছে যেসব বিষয়ের দায়িত্ব কেবলমাত্র ইল্‌ম এর অধিকারী উলামা ও মুসলমানদের মাঝে ভারপ্রাপ্তগণের উপরেই ন্যস্ত।

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মাতকে যে আনন্দপূর্ণ ওয়াদা করেছেন সেই আনন্দ যারা ধ্বংস করতে চায়, তারা প্রায়ই এই হাদীসটি বর্ণনা করে,

আবু হুরাইরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **“এই দ্বীন ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে, যার মাঝে ৭২টি জাহান্নামে যাবে এবং একটি জান্নাতে যাবে, আর সেটি হলো জামাহ।”**(৪৪)

---

(৪০)ইমাম ইবনে আবী আসীমের দ্বারা সংগৃহীত
(৪১)ইমাম আত্-তিরমিযির দ্বারা সংগৃহীত
(৪২)শরহে সহীহ মুসলিম, ভলিউমঃ ০৪, হাদীসটি সহীহ হিসেবে শ্রেণীভুক্ত
(৪৩)ইমাম মুসলিম দ্বারা সংগৃহীত এবং তার সহীহ-এর অন্তর্ভুক্ত
(৪৪)ইমাম তিরমিযির দ্বারা সংগৃহীত এবং শ্রেণীভুক্ত

ইল্‌মবিহীন তাকফীরপন্থী মানুষেরা এই হাদীসটি ব্যবহার করে বুঝাতে চান যে, উম্মাতের বেশীরভাগই জাহান্নামে যাবে, আর খুবই অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ জান্নাতে পৌছাতে পারবে। আর সাধারণত এই ধরনের মানুষেরা এই হাদীসে উল্লেখকৃত জান্নাতের মানুষ হিসেবে নিজেদেরকেই বুঝাতে চান।

এর চূড়ান্ত ফলাফল হলো, অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ আহ্‌লে সুন্নাতে পরিণত হন এবং বিশাল সংখ্যক মানুষ তাদের দৃষ্টিতে মুরতাদ (দ্বীন-ইসলাম ত্যাগকারী) বা সম্পূর্ন কাফের হিসেবে গণ্য হন। ইহা শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, বরং সেই সাথে ইহার ব্যাখ্যার কোন ভিত্তিও নেই।

যারা এই হাদীসটির প্রকৃত ব্যাখ্যা জানতে চান, তাদের উচিত এই হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবু ইসহাক আশ্‌-শাতিবি (রাহিমাহুল্লাহ) এর বক্তব্যের দিকে মনযোগ দেয়া, "ইহা (হাদীসটিতে উল্লেখকৃত জামাতটি) হলো ইসলামের অন্তর্ভুক্ত মানুষদের থেকে আস্‌ সাওয়াদ উল আযাম (সংখ্যাধিক্য ও বিপুল পরিমাণ মুসলমান)। আর এই কথাটির প্রমাণ মিলে আবু গালিবের বক্তব্য থেকে, যখন তিনি বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই সংখ্যাধিক্যবিশিষ্ট বিপুল পরিমাণ মুসলমানরাই হলো তারা যারা বিভাজন থেকে বিরত থাকে, তারা দ্বীনের আদেশ অনুসারেই সেটার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, আর ইহাই হলো সত্য।'"(৪৫)

এভাবে এই হাদীসটি সম্পর্কে ইহাই হলো প্রকৃত বুঝ যে, এই হাদীসের দ্বারা ইহা বুঝানো হচ্ছে না যে, উম্মাতের বেশীরভাগই সঠিক পথ থেকে ভ্রষ্ট হবে ও জাহান্নামে যাবে। এছাড়াও অপর একটি হাদীস অনুসারে এই কথাটি হাস্যকর হয়ে উঠে।

ইবনে আব্বাস দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উর্ধ্বাকাশে তুলে নেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি বিভিন্ন নবী ও সেই নবীদের অনুসারীদের অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। এভাবে তিনি একজন নবী ও সেই নবীর জাতিকে দেখলেন, এরপর একজন নবী ও তার গোষ্ঠীকে দেখলেন, এরপরে একজন নবীকে দেখলেন যার কোন অনুসারী নেই, এভাবে এক সময় তিনি মানুষের প্রচন্ড আকারের এক ভিড় (সাওয়াদ আযিম) দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, **"এরা কারা?" আর এর উত্তর ছিল, "এরা হলো মূসা ও তার জাতি, কিন্তু আপনার মাথা উঁচু করুন এবং উপরে দেখুন,"** এরপর নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, **"(আমি আমার মাথা উঁচু করলাম এবং দেখলাম) এক প্রচন্ড আকারের ব্যাপক মানুষের ভিড় (সাওয়াদ আযিম) যা এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত সমগ্র দৃশ্যপট জুড়ে ছেয়ে গিয়েছিল!" আর তখন বলা হয়েছিল, "এরা হলো আপনার উম্মাত...।"**(৪৬)

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, **"বনী ইসরাঈল ৭১টি ভাগে বিভাজিত হয়েছিল, আর এই উম্মাত তাদের চাইতে আরও একটি বেশী সংখ্যক ভাগে বিভাজিত হবে, আস্‌ সাওয়াদ উল আযাম (সংখ্যাধিক্য ও বিপুল পরিমাণ মুসলমান) ব্যতীত তারা সকলেই জাহান্নামে যাবে।"**(৪৭)

শাইখ উল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) ও এই বিষয়ে বলেছেন, "একটি (ভাগ) ব্যতীত আর সকলেরই জাহান্নামে পতিত হওয়ার মানে এই নয় যে, উম্মাতের বেশীর ভাগই সঠিক পথের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। বরং, এর মানে হলো অনেকগুলো পথভ্রষ্ট ভাগের সৃষ্টি হলেও সেগুলো সব মিলে লোকসংখ্যায় জান্নাতগামী ভাগ আহ্‌লে সুন্নাহ্‌ ওয়াল জামাহের লোকসংখ্যার চাইতে বেশী হতে পারবে না।"

---

(৪৫)আল 'ইতিসাম, ভলিউমঃ ০২, বাব উস্‌-সাবাব ইল্লাযী লি আজিহী

(৪৬)ইমাম আত-তিরমিযির দ্বারা সংগৃহীত এবং সহীহ হিসেবে শ্রেণীভুক্ত

(৪৭)ইবনে আবী গালিবের দ্বারা বর্ণিত এবং ইমাম আল হাকিম, আল খতিব আল বাগদাদী এবং আল বায়হাকির দ্বারা সংগৃহীত

সুতরাং, যখন আমরা বিভিন্ন রেকর্ডকৃত উক্তি শুনি যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা দেয়া বুঝ ও বক্তব্যের বিরুদ্ধে চলে যায়, তখন আমাদের কার কথা শুনা উচিত? যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাতের প্রতি এতই রাগান্বিত যে সে তাদের প্রায় সকলকেই কাফের বলে সাব্যস্ত করেছে, আমরা কি সেই ব্যক্তির কথা শুনবো নাকি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা শুনবো, যিনি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল এবং যার প্রতি আল্লাহ তাঁর ওহী নাযিল করেছেন?

=====***=====

উপসংহার

অবশেষে উপসংহারে কিছু পয়েন্ট আছে যা এই বইটির শেষে মনে রাখতে হবে:

১। অতিরঞ্জিত ও ভিত্তিহীন (অর্থাৎ দলিলবিহীন অথবা আহ্‌লে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কর্মপদ্ধতির বহির্ভূত) তাকফীরের প্রবণতা প্রকৃতপক্ষে অসৎ ইচ্ছা অথবা অসুস্থ মানসিকতার মানুষদের থেকেই উদ্ভূত হয়, যারা তাদের চারপাশের মানুষের প্রতি বিদ্রোহপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে। আর এই ধরনের লোকেরা তাদের সাথে কোন বিষয়ে বা কাজে ভিন্নমত পোষণকারীদের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হয়। সুতরাং, আমাদেরকে অবশ্যই এই ধরনের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করতে হবে, কারণ ইহা হলো দ্বীন ও দ্বীনের বিভিন্ন নিয়ম-কানূনের আবরণের দ্বারা লুকিয়ে রাখা এক ভয়ংকর ব্যাধি। আর নিশ্চয়ই এই কারণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকফীরী ও খারেজীদের বিরুদ্ধে অনেক কঠোর ও পরিষ্কার সব কথা বলেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তারা দ্বীন থেকে বেড়িয়ে যাবে। ইহাই তাদের বর্ণনা। আর সেই সাথে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন “আমি তাদেরকে সেইরূপে হত্যা করবো যেরূপে হত্যা করা হয়েছিল আদ এবং সামূদকে।” এ থেকে জানা যায় যে, তাদেরকে সবচাইতে নিকৃষ্ট ধরনের কাফের হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই কারণে আলেমগণ কখনো কখনো খারেজীদেরকে কাফের বলে সম্বোধন করেছেন, আবার কখনো কখনো রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিষ্কার উক্তির কারণে তাদেরকে কাফের বলে সম্বোধন করেননি। তবে তাঁরা (আলেমগণ) সকলেই এই ব্যাপারে একমত যে, যদি তারা (তাকফীরী মানুষেরা) দলবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের ক্ষতিসাধন করতে উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে যুদ্ধ করা উচিত।

২। আমাদের এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে যে, ভিত্তিহীন তাকফীর হলো এক ধরনের মিথ্যা অভিযোগের ন্যায়, আখিরাতে যেটির শাস্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করার শাস্তির সমান। এই কারণে বুখারীর হাদীসে কারো দিকে ভ্রান্ত তাকফীরের অভিযোগ নিক্ষেপ করাকে কারো পবিত্রতার বিরুদ্ধে ধারালো অস্ত্র নিক্ষেপ করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেন সে কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যাই করে ফেললো। আর অন্যায়ভাবে কোন ঈমানদারকে হত্যা করা হলো সবচাইতে বড় কবীরা গুনাহগুলোর মাঝে একটি। আর যদি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ভ্রান্ত অভিযোগ এনে তাকে এমন কোন নামে সম্বোধন করা হয় যা তার জন্য প্রযোজ্য নয় তবে আখিরাতে আল্লাহ সেই সম্বোধনকারী ব্যক্তিকেই সেই নামে ভূষিত করবেন এবং ফেরেশতাগণসহ অন্যান্য সকলেই এর সাক্ষী হয়ে থাকবেন, আর এই নাম বা শিরোনামটি সেই সম্বোধনকারী ব্যক্তির কপালে সীলমোহর মেরে দেওয়া হবে।

৩। ভিত্তিহীন তাকফীরের দ্বারা ভয়ংকর ক্ষতির সূচনা ঘটে। যার সমাপ্তির স্বরূপ আমরা আমাদের অপর গবেষণা “খাওয়ারিজ এবং জিহাদ” নামক বইটিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আর এর দ্বারা যার বিরুদ্ধে মিথ্যা কুফরের অভিযোগ আনা হয়, সেই ব্যক্তির অনেক বড় ক্ষতি করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের দাওয়াতের দা’য়ীদের অনেককেই তাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে কিংবা তাদের উদর চিরে ফেলা হয়েছে, আর এভাবে ভ্রষ্টতার শুধু বৃদ্ধিই ঘটতে থাকে। এছাড়াও অনেক দা’য়ীদের স্ত্রীদেরকে তাকফীরী মানসিকতার মানুষেরা তাদের সাথে কোন রক্তসম্পর্ক থাকার সুযোগে তাদেরকে প্রভাবিত করে তাদেরকে তাদের দা’য়ী স্বামীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের তাকফীরী মানসিকতার লোকেরা নিজেদের স্ত্রীদেরকে অপর মুসলমান দা’য়ীদের স্ত্রীদের কাছে পাঠিয়ে তাদেরকে প্রভাবিত করে এবং তাদেরকে তাদের স্বামীদের থেকে তালাক চেয়ে নেওয়ার জন্য প্রভাবিত করে।

৪। কিছু তাকফীরী মানুষ সাধারণ মুসলমানদেরকে মুরতাদ শাসনব্যবস্থার শাসকদের রক্ষা করার ভ্রান্ত দোষে দোষী সাব্যস্ত করে এবং এভাবে উম্মাতকে আরও কষ্ট দেয়। অপরদিকে কিছু মুর্জিয়া তাদেরকে খারেজী বলে সম্বোধন করে যারা ইসলামের শত্রুদের ব্যাপারে আহ্‌লে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের যা করণীয় সেই কাজই করে। আহ্‌লে সুন্নাতের অনুসারী মানুষ হলো প্রজ্ঞা অবলম্বনকারী মানুষ, আর প্রজ্ঞা এই দুই চরমপন্থার মাঝ বরাবর অবস্থান করে, যা হলো: অবজ্ঞা-অবহেলা এবং অতিরঞ্জন-অতিরিক্ততা। একজন মুসলমানের কখনোই খারেজী ও তাকফীরী মানুষদের ন্যায় অতিরিক্ত ও অতিরঞ্জিত আচরণ করা উচিত নয়। অপরদিকে তাদের মুর্জিয়াদের ন্যায় সব বিষয়কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে দেখাও উচিত নয়। আর বাস্তবতা হলো এই পৃথিবীতে কখনোই সকলকে একসাথে খুশী করা সম্ভব হবে না। তাই বিচক্ষণ মানুষদের উচিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকেই খুশী করার চেষ্টা করা এবং নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পদচিহ্নেরই অনুসরণ করা এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে যারা নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ করেছেন তাঁদের অনুসরণ করা।

৫। কিছু মানুষ আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামরত মুজাহিদদেরকে মুসলমান উম্মাত থেকে ভিন্ন কোন গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করেন এবং তাদের সাথে তাদের অপছন্দনীয় কোন গোষ্ঠীর (যেমন খারেজীদের) মিল খোঁজার চেষ্টা করেন। কিছু আন্তরিক মুসলমান মনে করেন যে, এই ধরনের মানসিকতার মানুষদেরকে (যারা আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত মুসলমানদের মাঝে তাদের অপছন্দনীয় গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য খুঁজেন) বরং খারেজী, মুর্জিয়া ইত্যাদি বলে ডাকা উচিত যেহেতু তারা মুসলমানদের (মুজাহিদদের) বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন ভ্রান্ত অপবাদ আরোপের সুযোগ খুঁজছেন। আবারও বলছি, যে সকল মানুষেরা মুসলমানদেরকে কোন শারীরিক ক্ষতি সাধন না করে ভিন্নমত পোষণ করেন তাদের প্রতি এরূপ পন্থা অবলম্বন করা আহ্‌লে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পদ্ধতি নয়। আমাদের এই কথাটি সবসময় মনে রাখতে হবে যে, মানুষ আমাদের সম্পর্কে কি ভাবে বা কি মত পোষণ করে সেই অনুযায়ী আমরা কোন মানুষের সাথে আচরণ করি না, বরং আল্লাহ সেই মানুষ সম্পর্কে যে মত পোষণ করেন এবং তার বা তাদের প্রতি তিনি যেরূপ আচরণের নির্দেশ আমাদেরকে দিয়েছেন আমরা মানুষদের সাথে সেই অনুযায়ীই আচরণ করি। ইহাই দাওয়াতী কাজে রত ব্যক্তির কর্মপদ্ধতি হওয়া উচিত, কারণ একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে গিয়ে যেকোন বিষয়েই ভিন্নমত পাওয়া যায়।

৬। সাধারণত তাকফীরী বা খারেজীরা সেই একই আয়াতসমূহ ব্যবহার করে যা আহ্‌লে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ ব্যবহার করে থাকেন, তবে তারা এক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব কিছু ব্যাখ্যা ব্যবহার করে। বর্তমানের তাকফীরীদেরকে দেখা যায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে তারা বিভিন্ন দলিল ব্যবহার করে। আর এর থেকে তাদের একটি দলিল সম্পর্কে ভুল বুঝ পরিষ্কার হয়ে উঠে। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিষয় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আয়াত এবং অন্যান্য দলিলসমূহ গোপন করে অপ্রাসঙ্গিক দলিল ব্যবহার করে।

৭। প্রকৃতপক্ষে এসব লোকের ছাত্ররা হলো বন্দী শ্রোতার মতো। তারা সরাসরি দলিল যাচাই-বাছাই করতে পারে না। ফলে তারা হয়তো আকীদার দিক থেকে তাকফীরী নয়, কিন্তু যারা তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে তারা উম্মাতকে বিভাজিত করে উম্মাতের বিশাল এক অংশকে ইসলাম, হক এবং আল্লাহর কাছে মুক্তি পাবার রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়। তারা উম্মাতকে ইল্‌মের এমন সব অংশ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায় যে সম্পর্কে আল্লাহ পুনরুত্থান দিবসে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন।

আর এই সাথে আমরা আমাদের অনুসন্ধানের উপসংহার টেনেছি। এই ব্যক্তির (আব্দুল্লাহ ফয়সাল) ছাত্রদের প্রতি এই আহবানই রইলো: এই আলোচনা ও এতে আলোচিত বিভিন্ন মূলনীতিসমূহ বুঝার পর ছাত্রদের উচিত হবে দলিলের অনুসন্ধান করা এবং তাদের উচিত হবে দলিল বুঝা ও উপলব্ধি করা। আর এরপর যদি দেখা যায় যে, আমরা এই আলোচনায় যা বলছি তাই সঠিক, তবে তাদের উচিত হবে সেই "শাইখ" এর কথা আর না শোনা। আর

তাদের উচিত হবে সেই “শাইখ”কে সংশোধিত করা। আর যদি তিনি সংশোধিত হতে না চান যা তিনি কয়েক বছর যাবত করে আসছেন, তবে তাকে বহিষ্কার করা উচিত।

কারণ নিশ্চয়ই এসব ছাত্রদের অনেক সাহায্যের প্রয়োজন। কারণ তাকফীরীদের মধ্যে দুই প্রকারের মানুষ দেখা যায়। তার একটি হলো বিভ্রান্ত তাকফীরী - বন্দী শ্রোতাদের তথা ঐ ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই এর অন্তর্ভুক্ত।

=====***=====

তাকফীরীদের ব্যাপারে ইমাম আহ্‌মদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল

“তাদেরকে কাফেরদের ন্যায় হত্যা করা, তাদের মধ্যকার আহতদেরকেও হত্যা করা, আর যদি তাদেরকে বন্দী করা যায়, তবে একজন কাফেরকে যেভাবে তাওবা করানো হয় তাকেও সেভাবে তাওবা করাতে হবে।”

(আল মুগনি, ভলিউম: ১০)